উত্তরে বাংলার মুক্ত কণ্ঠ

এখন ডুয়ার্স

অক্টোবর ২০১৯। ২০ টাকা

জল। জঙ্গল। জনসত্তা

শুরু হল ধারাবাহিক

‘রেনী’র ডুয়ার্স যুদ্ধের ডায়েরি’

ইঙ্গ ভুটান যুদ্ধের কথা। ১ম পর্ব

অন্যান্য ধারাবাহিক কাহিনি

শিলিগুড়ির কথা।

উপন্যাস। তাজ্জব মহাভারত

থ্রিলার। মরা মৌমাছির চোখ

গল্প। বাড়ি বদল

গান্ধীবাদ!
নাকি
গান্ধী বাদ?

ছুটি মানেই ডাকছে ডুয়ার্স!

দার্জিলিং বা সিকিম পাহাড়ে যে পরিমাণ পর্যটন বাণিজ্য হয়, তার একটি সামান্য অংশ পায় ডুয়ার্স। অথচ প্রকৃতির মোহিনী পসরা নিয়ে এসময় সেজে ওঠে ডুয়ার্সের নদী পাহাড় জঙ্গল। কিছু রিসর্ট, কটেজ, হোটেল নির্মাণ ছাড়া এখানে পর্যটনের পরিমাণ ও সম্ভাবনা আজও আশাব্যঞ্জক নয়।

SC/ST/OBC সার্টিফিকেট কবে পাবো?

উত্তর একটাই-
দরখাস্ত করার চার সপ্তাহের মধ্যে।

SC/ST/OBC সার্টিফিকেট পেতে মহকুমার ক্ষেত্রে SDO এবং কলকাতার ক্ষেত্রে DISTRICT WELFARE OFFICER-এর কাছে দরখাস্ত করুন এবং ফর্ম ১-এ রসিদ নিন।

নির্দিষ্ট সময়ে সরকারি পরিষেবা পাওয়া এখন আপনার আইনি অধিকার

পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন, ২০১৩

সময়ের সাথী আপনার সাথে

পরিষেবা পান সহজে সাথে সাথে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর, ১১ এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৮৭

বিশদ জানতে লগ অন্ করুন: **www.publicservicesright.in** এ

অথবা কল করুন: **1800 345 2808 (টোল ফ্রি)** নম্বরে

এখন ডুয়ার্স

ষষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৯

সম্পাদনা ও প্রকাশনা
প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদনা
শ্বেতা সরখেল

অলংকরণ
শান্তনু সরকার

সার্কুলেশন
দেবজ্যোতি কর
দিলীপ বড়ুয়া

মুদ্রণ অ্যালবাট্রস

ইমেল
ekhonduars@yahoo.com

প্রচ্ছদ শুভঙ্কর রায়

ডুয়ার্সে ব্যুরো অফিস।
অনিমা ভবন। শান্তি পাড়া।
জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে। এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই সংখ্যায় যা আছে

সম্পাদকের চিঠি ৪

ধারাবাহিক প্রতিবেদন
সার্জেন রেনী'র ডুয়ার্স যুদ্ধের ডায়েরি ৭
শিলিগুড়ির কথা ১২

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন
গান্ধীবাদ! নাকি গান্ধী বাদ? ১৪
ব্রিটিশ আমলের প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট বদলাচ্ছে নতুন আইনে কি
সত্যিই চা শ্রমিক-মালিক সংঘাত মিটবে? ১২

উত্তরের উপকথা
চা বলয়ের লোককথা ১৮

পাঠকের পর্যটন
মালঙ্গী পাড়ের বৃত্তান্ত ১৮
গজলডোবা হাওয়া মহল ২০
স্মৃতির দুয়ারে দুয়ারে ফিরি আলিপুরদুয়ারে ২২

ধারাবাহিক কাহিনি
তাজ্জব মহাভারত ২৩
মরা মৌমাছির চোখ ২৮

গল্প
বাড়ি বদল ৩২

কবির কলমে
চশমখোরের চশম ৩৫

শ্রীমতি ডুয়ার্স
আমার মেয়েবেলা ৩৬
সরমা ঃ মহাকাব্যে উপেক্ষিতা এক নারী ৩৭

নিয়মিত বিভাগ
খুচরো ডুয়ার্স ৫
ফেসবুক পোস্ট ৬
রাসায়নিক রস ৩৮

আবার আসিব ফিরে

পুজোটা ইবার জমল না বটে! বাপের বাড়িতে এসে বেশ নিরাশ হয়েছেন দেবী দুর্গা, বলাই বাহুল্য। সব কেমন যেন ঝিমিয়ে রয়েছে। কাত হয়ে পড়ে রয়েছে ইধার উধার। অথচ দেশ জুড়ে তিন মাস ধরে নির্বাচন যজ্ঞ হল হৈচৈ করে। মঞ্চে হম্বিতম্বি হল, হেলিকপ্টারে প্রতিশ্রুতির ঝড় এল, মাঠেঘাটে খুনখারাপি হল, রক্তের স্রোত নালা বেয়ে মিশল নদীতে। কিন্তু নদী উত্তাল হল না। তারপর পায়ে পায়ে শিবির বদল হল, হাতে হাতে পতাকা ধরানো হল। আইনে বদল হল, ভূস্বর্গে পরিবর্তন হল, চাঁদে পাড়ি দেওয়া হল, কিন্তু বাজারে জোয়ার এল না। হাজারে হাজারে লাখে লাখে নওজোয়ান আজও জানল না তার ভবিষ্যৎ কোন অন্ধকার গুহায় নিক্ষিপ্ত হবে, তার সামনে আলো জ্বালবার যে কেউ নেই! বিশ্বের তাবড় মঞ্চে সদর্পে ঘোষণা হল ভারত এবার দুনিয়াকে পথ দেখাবে, অথচ স্বামীজী থেকে গান্ধীজী কেউ এলেন না তাকে পথ দেখাতে।

এরকম ম্লান পুজো গত কুড়ি বছরে নাকি 'কোই দেখা নেহি'। বাজারের ভিনভাষী দোকানি নীরস বদনে তার পানরঞ্জিত ঠোঁট ওল্টায়, জানেই না সে আরও কতটা খারাপ হতে পারে মার্কেট। মল দোকানিরা ডিসকাউন্ট উপহারের লোভ দেখিয়ে খদ্দের টানে কিন্তু তারা ভালই জানে তা কখনও সমাধানের পথ নয়, স্রেফ টিকে থাকাটুকু ছাড়া কিছু নয়। আঠারো পেরিয়ে নয়া শতাব্দীর তরুণ বড় ভ্যাবাচ্যাকা, তার হাতে স্মার্টফোন ছাড়া আর কিছু নেই। স্ক্রিন ছেড়ে মাথা তুললেই সে দেখতে পায় ক্ষমতা দখলের নির্লজ্জ লড়াই, সে দেখে সেকেলে আদর্শ-বিপ্লব ফ্লেক্স হয়ে ঝোলে বাইপাসের হোর্ডিং-এ কিংবা পাড়ার ল্যাম্পপোস্টে। যে বাতিস্তম্ভে একদিন অত্যাচারী শোষককে পিঠ মোড়া করে বেঁধে রাখবার স্বপ্ন দেখিয়েছিল মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাওয়া সেকালের পাণ্ডারা।

বিগত শতাব্দীর সেই বুড়ো সমাজবিজ্ঞানীরাই বলছেন, উৎসবের রঙ আরও নাকি ফিকে হবে ক্রমে, হতে বাধ্য। কারণ মানুষের আজ বছরভর উৎসব, ফলে তার চাওয়াপাওয়াগুলি আজ আর আলাদা করে হিল্লোল তোলে না প্রাণে। সে আজ লাইন দিয়ে হাজার লোককে পোলাও খাওয়াবার ক্ষমতা রাখে বছরের যে কোনও দিন, সে আজ চাইলেই নতুন জামাকাপড় তুলে দিতে পারে শয়ে শয়ে বস্তিবাসীকে। সে আজ অনলাইনে অজস্র অন্তর্বাস কেনে অবলীলায়, ফেসবুকে হাজার লাইক পেতে পারে ইচ্ছে হলেই, পপুলারিটির গুপ্তমন্ত্র সে জেনে গিয়েছে কবে! সে আজ হাঁটুর চিকিৎসায় আকাশপথে পাড়ি দেয় অক্লেশে, পুজোর ছুটিতে মন্দারমনি বা মালয়েশিয়া তার কাছে অলমোস্ট সেম গেম। এক চাঁদে বেড়াতে যাওয়া ছাড়া অন্যকিছু সম্ভবত তার ধমনীতে স্রোত জাগাতে পারে না, উৎসব তো কোন ছাড়!

তবু রক্ষে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, ধনতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ বা হিন্দি আগ্রাসন নামক শব্দগুলি তার জানা বা শোনা। নিউজ নাকি সিরিয়াল! এ তর্ক তো থেমে গেছে সেই কবে! মুঠোফোনে চেপে সে আজ অতি সহজেই পৌঁছে যেতে পারে নিরাসক্তির নীল নেপচুন গ্রহে। তাই শত ঝঞ্ঝা তার কেশাগ্রে হিন্দোল জাগাতে পারে না, যেমন হৃদয়ে আর ঢেউ জাগায় না বীরেন্দ্রকৃষ্ণের আবাহনী স্তব। তাই এবারও পুজো সংখ্যা ছিল, গতে বাঁধা গদ্য বা অখাদ্য পদ্য ছিল, পুজোর শপিং ছিল, প্যাণ্ডাল হপিং ছিল, হিংরেজি বুলি ছিল, বিজয়ার কোলাকুলি ছিল। এবারও পেয়ার ছিল, সহস্র শেয়ার ছিল। তাই দেবী এসেছিলেন, ফের আসবেন। ভুবন মেতে উঠেছিল কতটা বলা কঠিন, তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা ছিল, সামনের বার আবার এসো মা! জলকাদায় এবার তো যত্নআত্তি করতে পারলেম না তেমন, তবু এসো! মনে রেখ মা, তুমি যতদিন ফিরে ফিরে আসবে, এই বাংলা ততদিন বেঁচে থাকবে তবু।

পাঠকের জন্য শুভ বিজয়া ও দীপাবলির ভালবাসা রইল অঢেল।

প্রদোষ রঞ্জন সাহা

এখন ডুয়ার্স পত্রিকা প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড ৯৪৩৪৩২৭৩৪২

শিবমন্দির
অনুপ দাস, শিবমন্দির বাজার ৯৫৬৪৯৯৮৫৬১

জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে ৯৭৩৩২৪৬৯১৩

মালবাজার
সম্রাট (হোম ডেলিভারি) ৯৩৩২০০৫৮৬৫

চালসা
দিলীপ সরকার, চালসা মোড় ৯৭৭৫৪১৫১৪৪

বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল ৯৪৩৪৮০৯৫৯০

বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা ৯৫৯৩৩৫৪১৫২

মাদারিহাট
জগৎ চৌধুরী (হোম ডেলিভারি) ৯৩৮২৯৭৭৬২৯

লাটাগুড়ি
সৌমেন (হোম ডেলিভারি) ৯০০২৪০৯৮৯৩

ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট ৯৯৩৩১৯০৮৫৮

ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল ৯৪৩৪৪১২৬৪৯

তুফানগঞ্জ
আনন্দবাজার বুক স্টল ৯৩৩৩৬৮৮৬৭১

দিনহাটা
হরিপদ রায় ৯৯৩২৬৩৯০৬৮

আলিপুরদুয়ার
দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭

কোচবিহার
জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে ৯৪৩৪২১৭০৮৪

মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি ৭৮৬৪৯৯৫৫১৫

বালুরঘাট
মাধববাবু ৯১২৬২৬০৬৬৩

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন ৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার ৪০৬৪৪০৯৭

এখন ডুয়ার্স-এ লেখা পাঠান
হাতে লিখে নয়, টাইপ করে

ডুয়ার্স সংক্রান্ত আপনার কোনও লেখা থাকলে টাইপ করে পাঠান। আপনার লেখা সম্পাদকমণ্ডলীর পছন্দ হলে এই পত্রিকায় তা ছাপা হবে। লেখার বিষয়বস্তুর উপর ছবি থাকলে অবশ্যই পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা
এখন ডুয়ার্স। শান্তি পাড়া। অনিমা লজের পেছনে।
জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১। অথবা মেল করতে পারেন নিচের মেল আইডি-তে editor.ekhonduars@ yahoo.com

এখন ডুয়ার্স
ডুয়ার্সের নিজস্ব বই ও পত্রিকা
পরিবেশ। পরিকাঠামো। পর্যটন
জঙ্গল। জনসত্তা
শিক্ষা। স্বাস্থ্য। সাহিত্য। সংস্কৃতি

কবি পুরন্দর ভাটের অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার

(বহু চেষ্টার পর মহাকবি পুরন্দর ভাটের একখানি সাক্ষাৎকার পাওয়া গিয়াছিল। ডুয়ার্স ভ্রমণের পূর্বে এই সাক্ষাৎকার পড়িলে কাজে দিবে। সাক্ষাৎকারের বক্তব্য বিষয়ে কলম সিং-এর দায় নাই। সম্পাদকেরও নাই। পুরন্দরবাবুর দায় আছে কি না তাহা বলিতে পারি না।)

১

কলম: নমস্কার, কেমন আছেন?

পুরন্দর: ভাটের আলাপ ছাড়ুন। টাইম নেই। শ্মশানে সম্মেলন আছে। দেবীপক্ষ পড়িলেই বোতল খুলিব।

কলম: ডুয়ার্সে পূজাবকাশে পাব্লিক বেড়াইতে যাইবে—এ বিষয়ে আপনার উপদেশ কী?

পুরন্দর: ডুয়ার্সে আসিয়া কেবল হাতি দেখিলেই হইবে না। হাতিকে যাহারা জন্ম দেয়, সেই হাতিনীদেরও দেখিতে হইবে।

কলম: হাতি আর হাতিনীর তফাৎ বুঝিবে কী করিয়া?

পুরন্দর: হাতির কাছাকাছি গিয়া সেলফি তুলিতে হইবে। তেড়ে আসিলে বুঝিবে মহিলা, আছাড় দিলে পুরুষ।

কলম: তাহা হইলে তো টুরিস্টকে জঙ্গলের ভিতর লুকাইয়া প্রবেশ করিতে হইবে।

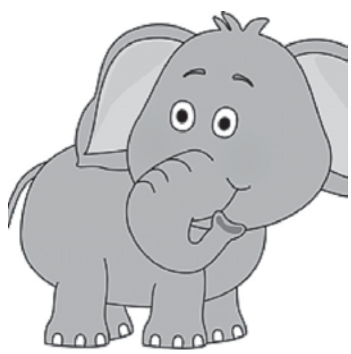

পুরন্দর: আ মলো যা! ডুয়ার্সের হাতি তো লোকালয়েই থাকে। এর বাগানে কাঁঠাল, ওর খেতের ধান খাইয়া বেড়ায়। তেমন বাঙলো বুক করিতে পারিলে হাতি ব্রেকফাস্ট খাইতেও আসিবে। তবে টুরিস্টের লাক ভাল হইলে ভ্রাম্যমান হাতির পাল চোখে পড়িতে পারে। আর যদি বেশি নেশা হয় তবে বাঘের পাল দেখাও বিচিত্র নহে।

কলম: ডুয়ার্সে বাঘ আছে?

পুরন্দর: দশ-বারোটা আছে। তবে কি না দশ-বারোটা বাঘ আসলে একটাই বাঘ। আমি এই কারণেই লিখিয়াছিলাম (আবৃত্তি) —

ডুয়ার্স ভূমিতে নদী-বিল-খালে
একটাই বাঘ ঘোরে পালে পালে।

কলম: বাইসন? বাইসনের পাল তো দেখা সম্ভব?

পুরন্দর: বাইসনের বন্যা বহিতেছে। ফিরিবার কালে টুরিস্টরা মাথা পিছু একখানা করিয়া বাড়ি লইয়া গেলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কিছু বলিবে না।

কলম: গন্ডার? গন্ডার কিন্তু কম নাই, বেশিও নাই।

পুরন্দর: মরণ! শুধু গন্ডার দেখিতে ডুয়ার্সে আসিবে কেন? মানাস যাইবে।

কলম: একাদশীর দিন ভান্ডারনীর পূজা দেখিতে পারে।

পুরন্দর: কে কী কবে দেখিবে তাহা রেলের টিকিটের উপর নির্ভরশীল বাছা।

২

কলম: কাল পুরা সাক্ষাৎকার হয় নাই। আবার শুরু করিতেছি। আপনি কি জানেন যে ডুয়ার্সে এখন জায়গা খালি নাই, সব বাঙলো আর লজ বুক্‌ড্‌?

পুরন্দর: শুনিয়া খুশি হইলাম। আর বেশি দিন নাই। ইহার পর ডুয়ার্সে ভরা মরসুমে টুরিস্ট রাস্তায় খাটিয়া পাতিয়া থাকিবে। তবে আমার একটা পরিকল্পনা আছে। বনমন্ত্রীকে মেইল করিব।

কলম: 'এখন ডুয়ার্স'-এর পাঠকদের জন্য একটু বলিবেন?

পুরন্দর: গন্ডারের থাকিতে অনেক জায়গা লাগে। মরসুম পড়িলে দশখানি গন্ডারকে যদি চারটি রিসর্টে ভাগ করিয়া রাখা যায় তবে অনেকটা ঘাসজমি ফাঁকা হইবে। সেখানে টুরিস্ট থাকিতে পারিবে।

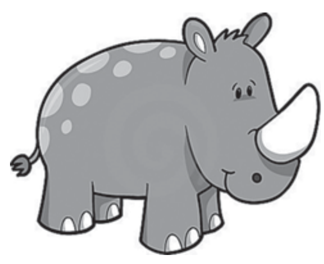

কলম: এ কেমন প্রস্তাব? টুরিস্ট তবে গন্ডার দেখিবে কী করিয়া?

পুরন্দর: রিসর্ট হইতে জঙ্গলে যাইয়া গন্ডার দেখিবার যতটা সম্ভাবনা, তাহার চাইতে ঢের বেশি নিশ্চয়তা জঙ্গল হইতে রিসর্টে আসিয়া গন্ডার দেখায়।

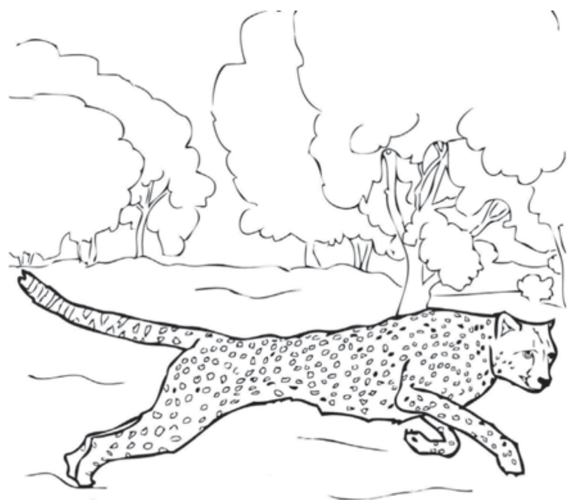

কলম: জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্র বিপন্ন হইবে!

পুরন্দর: আমি কনসেপ্ট বদলাইবার পক্ষে। পরিবর্তনকে মানিতে হইবে। জঙ্গলে চিতাবাঘের জন্য সুলভ মাংসের দোকান খুলিলে কেমন হয়?

কলম: মানে? কে বেচিবে?

পুরন্দর: সিভিক পুলিশ কিংবা প্রাইমারির টিচারকে দায়িত্ব দেওয়া যায়। টুরিস্ট কিনিবে আর বাঘকে খাওয়াইবে।

কলম: বুঝিয়াছি। আপনি রসিকতা করিতেছেন। আচ্ছা, সে কথা থাক। টুরিস্টদের প্রতি আপনার উপদেশ কী রূপ?

পুরন্দর: কহিতেছি— (আবৃত্তি)

হে ডুয়ার্স! ভান্ডারে তব কত হাতি-বাঘ
দেখা হলে এ ওর সাথে করে হাগ্‌।
ন্যাওড়া ভ্যালির বন, ভোরের আলো
দেখ আর পিরিচে কোহল ঢালো।
পাহাড়েতে যাও যদি খাসা ওয়েদার
পায়েতে পরিও মোজা গায়ে সোয়েটার।
হে টুরিস্ট ভিড় করি ডুয়ার্সে আসো
হিহি-হোহো-খ্যাক খ্যাক কেবলই হাসো।
কবিতার খাতা ভরো নিয়া ডট পেন
ডুয়ার্সে বাতাস নাই, খালি অক্সিজেন।

কলম: অনেক ধন্যবাদ! টুরিস্টদের বলিতেছি, আপনারা দলে দলে আসুন। কবিতার খাতিরে অক্সিজেনের ব্যাপারটা বাড়াইয়া বলা হইয়াছে। ইহার মানে, বাতাসে অক্সিজেন বেশি। যাওয়ার সময় সিলিন্ডার ভরিয়া লইয়া যাইতে পারেন। ধন্যবাদ।

কলম সিং

সেরা পোস্ট

শুভ্র মৈত্র

লুকোচুরি

শ্যামলাল কোনও ঐতিহাসিক পুরুষ নয়। তার জীবনে সমস্যা গুলির মধ্যে তেমন রঙ নেই। মানে, আর পাঁচটা ছাপোষা বাঙালী যেসব চিন্তায় ভোগেএই যেমন সকালে পেট পরিষ্কার করা (ইদানীং অবশ্য সকালে উঠেই মোবাইলও পরিষ্কার করতে হয়, এত গুড মর্নিং আর গুড নাইট মেসেজ!), মাসের মাঝামাঝি এসে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে তাকিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলা আর ক্যালেন্ডারের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে থাকা, গিন্নীর ঠিক কী কারণে মুখ ভার তা বোঝার চেষ্টা করা, অপিসের বড়বাবু আর দেশের অর্থমন্ত্রীকে পালা করে ওলাওঠা'র অভিশাপ দেওয়া, প্রতিবেশীর ঝাঁ চকচকে মারুতির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে পরিবেশ দূষণ বা হাঁটার উপকার নিয়ে সব্জীওয়ালাকে জ্ঞান দেওয়া— বা খুব বেশি হলে রবিবার চারশো গ্রাম মাংসের জন্য পাঁঠার ঠ্যাং, গলা, বুক প্রায় বিয়ের পাত্রীর মতো খুঁটিয়ে দেখা তারপর এক্সট্রা মেটের জন্য ঝুলোঝুলি করা— এ সব নৈমিত্তিক ঝঞ্ঝাট ছাড়া বেশি তাকানোর দূরদৃষ্টি শ্যামলালের কোনওদিন ছিল বলে জানা যায় নি। যেমন চাঁদের পিঠে বিক্রম ঠিক কোথায় বা বালাসাহাপুর থেকে বালাকোট ঠিক কত দূরে— এ সব নিয়ে কোনওদিন মাথা ঘামায় নি শ্যামলাল।

খুব সঙ্গত কারণেই তার সমস্যাগুলিও তাই ইতিহাসের পাতায় লেখা হয় নি। এই যেমন ধরুন এই মুহূর্তের শ্যামলালের সংকট। এই ভোরবেলায় গিন্নী যখন ঘুমিয়ে আছে সে তখন মাছওয়ালাকে পাঁচশো গ্রাম বাটা মাছের জন্য দরদাম করে সত্তর টাকায় রফা করেছে। নাহ, শালার কাছে পাঁচশো'র খুচরো নেই। আর শ্যামলালের কাছে একশো'র নোট নেই। এসব ক্ষেত্রে যা হয়, গিন্নীর ব্যাগই প্যান্ডোরা বাক্স। শ্যামলাল শুনেছে, বউয়েরা নাকি স্বামীর পকেট কাটে, এবং সেটা নাকি চুরি নয়, গণতান্ত্রিক অধিকার। অথচ শ্যামলাল চিরকাল বউয়ের ব্যাগ কেটেই গেল। নাহ, পৌরুষ না কি যেন, সেসবে লাগে না শ্যামলালের। এমনকি, চুরি বিদ্যা মহা বিদ্যা জাতীয় কথাও এক্ষেত্রে খাটেনা। কারণ, বউয়ের হিসেবই থাকে না ব্যাগে কত টাকা থাকে। ফলে, জানতেও পারে না, কত টাকা সরাল শ্যামলাল। শুধু খুঁজে পেতে প্রথমে একটু অসুবিধা হয় এই যা। ও বেশ নিশ্চিন্তেই ঢুকেছিল বেড রুমে। ব্যাগের অবস্থানও জানা। বউ ঘুমোচ্ছে।

কিন্তু বিপত্তিটা বাধল এর পরেই। ব্যাগ খুলে ঘাবড়ে গেল শ্যামলাল। কী নেই! মূল চেম্বারে একটা রুমাল। এক খোপে টিপের পাতা, আরেকটায় সেফটিপিন, চুলের ক্লিপ, সাথে লিপস্টিক। অন্যটায় পেন, খোলা আধ ফুরোনো রিফিল, নিচে কিছু খুচরো পয়সা, কারও গায়ে আবার সিঁদুর লাগা, —নিশ্চয়ই রিক্সাওয়ালার জন্য। অসংখ্য টুকরো কাগজ, কোনোটায় ফোন নম্বর লেখা, কোনটায় দর্জির কাপরের টুকরো সাঁটা। উফফ, টাকা কোথায়? এদিকে মাছওয়ালার বোধহয় মাছ কাটা শেষ হলো। এখনি টাকার জন্য তাগাদা দেবে। এর আগেও দু'একবার ঝঞ্ঝাট হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা এতক্ষনের নয়। —ওহ, এই যে আরেকটা ছোট খোপ পাওয়া গেছে! এটায় নিশ্চয়ই টাকা! দেখি। ...ও হরি, এটার থেকে বেরোল হলদে হয়ে যাওয়া একটা পাসপোর্ট সাইজের ছবি। কি কাজে লাগবে কে জানে! উফফফ, মেয়েদের ব্যাগে ঠিক কতগুলো খোপ থাকে? এই সাত সকালেও বিনবিনে ঘাম জমছে শ্যামলালের কপালে। ব্যাগে টাকা নেই? এ হতেই পারে না! তাহলে?

হাল প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল শ্যামলাল। মাছওয়ালাকে বলবে, 'কালকে নিস', ব্যাগটা রাখতে গিয়েই ঘুমজড়ানো গিন্নীর গলা, 'বাইরের দু নম্বরটায় টাকা আছে...'। যাচ্চলে, এতক্ষণ ধরে শ্যামলালের নাজেহাল হওয়াটা সবটাই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখেছে? তার চেয়েও বড় কথা, এতদিন ধরে সবটাই জানা ছিল তাঁর??? আর চুরি করে শ্যামলাল কিনা শ্লাঘায় ভোগে? প্রায় নির্জীব হাতে টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে আসার মুখে দেখল, সকালের কাগজ পড়ে আছে— "রাজীব এখনও অধরা..."।

শ্যামলাল বুঝলো, যারা খুঁজছে, তাদের অবস্থা ওর নিজের মতোই, কবে নিখোঁজ গোয়েন্দা প্রধান নিজে থেকেই বলেন, 'এই যে আমি এখানে...'

বিরূপাক্ষ মিত্র

স্কুল থেকে ফিরে খেয়ে নিয়ে জানালার ধারের খাটে বই মুখে করে শুয়ে পড়তাম। তখন মর্নিং স্কুল ছিল। জানালাগুলোতে বাঁকা বাঁকা গ্রিল লাগানো আমাদের বাড়িতে। আমি গ্রিলের ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখতাম। খবরের কাগজে পুজোর আগে একটা আঁকা ছবি দেখেছিলাম। একটা নদী বয়ে চলেছে। একটা পাল তোলা নৌকা চলেছে নদী বেয়ে। নদীর ধার কাশ ফুলে ভরে রয়েছে। একটা ছোট্ট ছেলে নদীর ধারে ঘুড়ি নিয়ে দৌড়চ্ছে। আকাশের রঙ ঘন নীল। আর পেঁজা তুলোর মত মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে। আমি জানালা দিয়ে সেই আকাশটা খুঁজতাম। মা ছবিটা আমাকে দেখিয়ে বলেছিল যে ছবির সেই ছোট্ট ছেলেটা নাকি পেছন থেকে ঠিক আমার মত। অনেক উঁচুতে শকুনের দল গোল হয়ে চক্কর কাটত। আমি জানালা দিয়ে দেখতাম আর ভাবতাম যে ওদের দৃষ্টিশক্তি তো খুবই প্রখর। তাই ঠিক যেমন আমি ওদের দেখতে পাচ্ছি, ওরাও হয়ত আমাকে দেখতে পাচ্ছে। আজকাল আর শকুন চোখে পড়ে না তেমন। ওরা হারিয়ে গিয়েছে ঠিক যেমন আমার ছেলেবেলাটাও কেমন যেন হারিয়ে গেল।

দিদিভাই বলত, 'পুজোর একটা গন্ধ আছে, জানিস।' আমি নাক টেনে টেনে শুঁকতে থাকতাম। আলাদা গন্ধ পেতাম না। অবাক হয়ে ভাবতাম, বলে কি!! পুজোর আবার আলাদা গন্ধ হয় নাকি? বোনকে জিজ্ঞেস করতাম, ' আচ্ছা, দিদিভাই পুজোর গন্ধ পায়। তুই কি পাস নাকি? কই, আমি তো পাই না।' ও ঠোঁট উলটে বলত, 'দাদামণি, তুই একটা বোকা। দিদিভাই কোন গন্ধই পায় না। শুধু বিজ্ঞের মত হাবভাব করে।'

হোস্টেলে চলে গেলাম ক্লাস ফাইভে। মোটেও যেতে চাই নি। বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার একদম ইচ্ছা ছিল না আমার। মাকে ছেড়ে থাকতে আমার খুব কষ্ট হত। প্রথম প্রথম খুব কাঁদতাম। রাতে ঘুম আসত না। দম বন্ধ হয়ে আসত। পুজোর ছুটি তিন মাস পরে। রোজ রাতে শুতে যাওয়ার আগে ক্যালেন্ডারে সেই দিনকার তারিখটা পেন দিয়ে কেটে দিতাম। বাড়ি যাওয়ার একটা দিন অন্তত আমি এগিয়ে গেলাম। রাতে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতাম বাড়ি গিয়ে কি কি করব। আবার মায়ের পাশে শোব। একটা ক্যাপ ফাটানোর বন্দুক কিনতে হবে। রোল ক্যাপ আগুনে ধরলে পট-পট করে ফাটে। পাপু, অমিত, বান্টিরা তো আছেই। ক্রিকেট খেলতে হবে প্রাণ ভরে। সন্ধ্যাবেলা দিদিভাই এর সাথে ঠাকুর দেখতে বের হব। এইসব ভাবতে ভাবতেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়তাম।

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল একদিন সত্যিই। বড়কাকুর সঙ্গে বাড়ি ফিরে এলাম পুজোর ছুটিতে। স্টেশনে নেমে একটা গন্ধ এল নাকে। আমার শহরের গন্ধ। যে শহরে আমার বাড়ি, তার গন্ধ। রিক্সা করে বাড়ির পথে যেতে যেতে দেখি কদমতলা দুর্গাবাড়ির মন্ডপ সজ্জা প্রায় সম্পূর্ণ। ধূপের গন্ধ এল নাকে। আমার খুব পরিচিত। কিছু ছেলে কালীপটকা ফাটাচ্ছিল। বারুদ পোড়া গন্ধও পেলাম। জিলিপীর দোকান থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ আসছে। ঠাকুর এসে গিয়েছে। মা দুর্গা দেখি আমার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছেন। বাড়ি ঢুকলাম। মার রান্নার গন্ধ পেলাম। বোন ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল। মার হাসিমুখে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে বেড়িয়ে এল। মনে হল বাড়িতে আমি প্রথম এলাম। কি আনন্দ কি আনন্দ। দিদিভাই মুচকি হেসে বলল, ' যাই বল না কেন, পুজোর কিন্তু একটা আলাদা গন্ধ আছে।'

সার্জন রেনী'র 'ডুয়ার্স যুদ্ধের ডায়েরি'

ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধের ঐতিহাসিক লিপি

উমেশ শর্মা

সেসময় ভারতে ব্রিটিশবাহিনিতে কর্মরত এক মিলিটারি সার্জন চারমাসের ছুটিতে দেশে ফিরেছিলেন। ভুটান নামক আজব দেশটির কথা ইওরোপের মানুষকে জানানোর ইচ্ছা ছিল তাঁর। ব্যস লিখে ফেললেন একটা বই। সার্জন রেনীর 'ভুটান এন্ড দ্য স্টোরি অব্ দ্য ডুয়ার ওয়ার' বইটি ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের ডুয়ার্সভূমির দুর্দান্ত ছবি উঠে এসেছিল সেই বই থেকে। দেড়শ বছর আগে ঠিক কেমন ছিল আমাদের ডুয়ার্স! যেসময় কলকাতায় জন্ম নিচ্ছেন বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ আর কোচবিহারে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ, সেসময় দীর্ঘদিন ধরে লুণ্ঠনে অত্যাচারে ও যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ডুয়ার্সের জীবনচিত্র উঠে আসে মানসপটে। আজকের আগ্রহী বাংলাভাষীদের সুবিধার্থে এবং জনপদের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের তাগিদে ওই সুবিশাল গ্রন্থটি আক্ষরিক অনুবাদে নয়, ভাবানুবাদে মনস্ক পাঠকের দরবারে নিবেদিত হল, ধারাবাহিক হিসেবে।

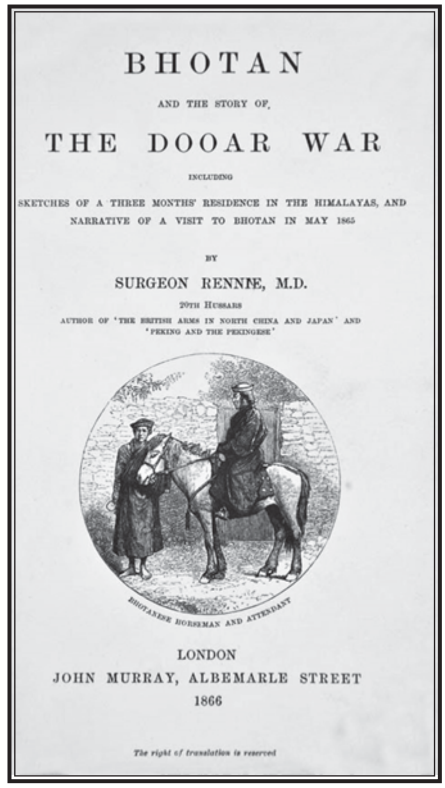
BHOTAN

AND THE STORY OF,

THE DOOAR WAR

INCLUDING

SKETCHES OF A THREE MONTHS' RESIDENCE IN THE HIMALAYAS, AND NARRATIVE OF A VISIT TO BHOTAN IN MAY 1865

BY

SURGEON RENNIE, M.D.

20TH HUSSARS

AUTHOR OF 'THE BRITISH ARMS IN NORTH CHINA AND JAPAN' AND 'PEKING AND THE PEKINGESE'

BHOTANESE HORSEMAN AND ATTENDANT

LONDON

JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET

1866

The right of translation is reserved

প্রাক্ কথন

ভুটান কখন থেকে দুই দশক কিংবা ততধিক কাল তিব্বতি শাসনের অধীনে ছিল কিংবা কোচবিহার রাজবংশের কোন শরিক (টেপু) ভুটানে শাসন শুরু করেছিলেন, তা পণ্ডিতদের বিতর্কিত বিষয়। কিন্তু ২৬০৩০'-২৮০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮০৪৫'-৯২০২৫' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের দেশ ভুটান শুধু দু'দশক নয়, দুই শতক ধরে ছিল তিব্বতিদের দখলে।

ভুটানের উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে রায়কত রাজ্য, কোচবিহার ও অসম, পশ্চিমে তিস্তা ও করতোয়া, পূর্বে ধানসিঁড়ি নদী ও তোয়াঙ রাজার রাজত্ব। ভুটানের দৈর্ঘ্য ২২০ মাইল ও প্রস্থ ৯০ মাইলের মত। তবে, ১০-৩০ মাইল প্রস্থে ওই দেশের কোনও কোনও স্থান উচ্চ পর্বতাকীর্ণ ও দুর্গম। পূর্ব তিব্বতের পটচিন এবং উত্তর-পশ্চিমে আরি তিব্বতিদের খাদ্য-পোশাক, ভাষা-সংস্কৃতির মধ্যে ফারাক বিস্তর। মঙ্গোলীয় জনজাতির সংমিশ্রণে উত্তর-পশ্চিমি তিব্বতিদের অশন-ভূষণ, ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে লেপচা, ভুটিয়া, সিকিমি ও তিব্বতিদের যে মেলবন্ধন ঘটেছিল— আপাতদৃষ্টিতে সেসবের বিভাজন করা ছিল খুবই কঠিন। চিনা, ভুটিয়া, ধর্মভুটিয়া, নেপালি ভুটিয়া কিংবা সিকিমি ভুটিয়া— সকলেই যে ভুটানের ভুটিয়া ছিলেন, তা যেমন বেঠিক নয়, তেমনই কোচবিহারের ভুটানিরা দোভাষিয়া ভুটানি হয়েও, একটা পৃথক জাতিসত্তা নিয়ে ভুটানেও বসবাস করতেন।

দাবি করা হয় (পেম্বারটন) যে, সান-পো নদীর দক্ষিণের অংশ ও উত্তরের বরফঘেরা পার্বত্য শৈলশিরা বেষ্টিত ভুটান এককালে তিব্বতেরই অংশ ছিল। তিব্বতিরাই ভুটানের নাম দিয়েছিল কাম্পা এবং কাম্পা ছিল বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন আপনভোলা ভোট বা তিব্বতিদের এক দেশ।

ওই দেশে ঢোকার ছিল আঠারটি সামান্য চেনা পথ। লোকে বলত আঠার দুয়ার। উত্তরবাংলায় বসবাসকারী কোচ-মেচ-রাভারা এবং অসমের দরং-কামরূপ জেলার অসম জানজাতির লোকেরা ওই আঠারটি পথ ধরে, ভুটানে যে যাতায়াত করতেন, বাণিজ্যিক যোগাযোগ রাখতেন, তা শুধু উভয় দেশের বসবাসী, পাহাড়বাসী লোকেদের পেটের তাগিদেই। ভুটানের সঙ্গে বহির্জগতের রাজনৈতিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল বহু অন্ধকার শতাব্দী পেরনোর পর। কোচবিহারের কোচরাজাদের সঙ্গে কিংবা তিব্বতি ধর্মগুরুদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল স্থানিক। লন্ডনের বণিক র‍্যালফ ফিচ ১৫৮৩ সালে কোচবিহার থেকে ভুটানে গিয়েছিলেন এবং তিনি ভুটানে ধর্মরাজার কথা উল্লেখ করেছিলেন। ১৬২৮ সালে ফাদার ক্যাব্রাল ও ফাদার দিয়াজ নামে দুই মিশনারী জেসুইট তিব্বতের শিগাতগে যখন গিয়েছিলেন, তখন ওই অঞ্চলে কোনও আনুষ্ঠানিক শাসনতন্ত্র তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। অথচ ১৬৪২ সালে বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত রাজাদের দখলে থাকা পূর্ব মোরাঙ যখন দখল করে নেন, তখন সিকিমে শাসনতন্ত্রের পদধ্বনি উপলব্ধি করা যায়। আবার স্যার যোশেফ ডাল্টন হুকার ও ডা. ক্যাম্বেল ১৮৪৯ সালের নভেম্বরে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যখন সিকিম অভিযানে গিয়েছিলেন, সঙ্গে একটি দলও ছিল, তখন উভয়কে সিকিমে বন্দি করা হয়েছিল। ব্রিটিশ রাজশক্তির তৎপরতায় ২৪শে ডিসেম্বর তাঁরা মুক্তি পেয়েছিলেন। রাজশক্তির উদ্ভব ও ক্ষমতাবান হওয়ার যে মাশুল সিকিমকে দিতে হয়েছিল, তা সকলেরই জানা।

১৬২৮ থেকে ১৮৪৯ সালের মধ্যে ব্যবধান দীর্ঘ ২২২ বছরের। তিব্বত, ভুটান যখন অন্ধকারে, সিকিম কিন্তু দীর্ঘ শাসনক্ষমতায় ক্রমাগত জেগে উঠতে থাকে। ব্রিটিশ সরকারের লোভ হয় এখানেই। ভুটান, তিব্বতে শক্তিশালী রাষ্ট্রশক্তি গড়ে উঠুক বা না উঠুক— ওই বিস্তৃত এলাকায় ব্রিটিশ বাণিজ্যের বিস্তার দরকার। সিকিমের সঙ্গে সংঘর্ষ ও চুক্তি,

দার্জিলিং সৃষ্টির কারণ ওই বাণিজ্য অভীপ্সা। ওই একই লক্ষ্যে ১৮১৪-১৫ সালে ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম উদ্যোগ বোধহয় সেটিই। কারণ, ওয়ারেন হেস্টিংসের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জনপদ নেপালের পূর্ব মোরঙয়ের দিকে নজর দিয়েছিলেন শুধুমাত্র তিব্বতে যাবার পথের সন্ধানেই। ১৭৮৪ সালে শান্তির বার্তা নিয়ে হেস্টিংস নেপালে একটি মিশন পাঠিয়েছিলেন। ওই মিশনের নেতৃত্বে ছিলেন ফক্সক্রস্ট।

১৭৮৪ সালের মাঝামাঝি হেস্টিংস স্বদেশে চলে গেলে সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলে নেপালি আক্রমণ ঘটতে থাকে (১৭৮৬)। নেপালের পৃথ্বিনারায়ণ শাহ মোরাঙ অধিকারের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন ১৭৭০ সালেই। কোম্পানির সঙ্গে বন্ধুত্ব চুক্তি করে অর্থাৎ সামান্য কর দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে এগতেই থাকেন। বিপরীতভাবে হেস্টিংসও ওই উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেও পৃথ্বীনারায়ণকে দিয়ে ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের দমন করার কাজে সহায়তা লাভের প্রতিশ্রুতি আদায় করে একধাপ এগিয়েছিলেন। পূর্ব মোরাঙ বন্ধু রাষ্ট্রের অধীনে গেলেও কোম্পানির উদ্দেশ্যসাধনে আর কোনও বাধা হবার কথা নয়।

নেপাল বন্ধু রাষ্ট্র হবার পর, একইভাবে বন্ধুরাজ্য হয়ে ওঠে কোচবিহারও। ১৭৭৩ সালে ভুটান-কোচবিহার সংঘর্ষে হেস্টিংস মধ্যস্থতার ভূমিকা করেন এবং ১৭৭৪ সালে ইঙ্গ-ভুটান চুক্তি সম্পন্ন হয়। করদ রাজ্যে পরিণত হয় কোচবিহারও। এভাবে নেপাল, সিকিম, ভুটান, কোচবিহার ও বৈকুণ্ঠপুরে— উত্তরের এই পার্বত্য জনপদগুলিতে ক্রমাগত ব্রিটিশদের আধিপত্য বেড়ে যেতে থাকে। তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের পথটি সুগম হতে থাকে।

কিন্তু এই অগ্রগমন একদম মসৃণ ছিল না। ১৭৭০ সালে নেপালের রাজা পৃথ্বীনারায়ণের সঙ্গে ব্রিটিশদের সম্পর্কের কিছুটা অবনতি ঘটতে শুরু করে। ১৭৭৬ সালে চুক্তি অবহেলা করে, নেপালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার (কারণ পৃথ্বীনারায়ণ শাহ ১৭৭১ এ প্রয়াত) ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করলে, ব্রিটিশরা শঙ্কিত হয়ে ওঠে (রংপুর রেকর্ডস, ভলুম-১)।

নেপাল পশ্চিম সিকিমের ইলামবাজার দখল করে, সিংহলিলা গিরিমালা অতিক্রম করে সিকিমে প্রবেশ করেছিল একবছর আগে। চুক্তিও হয়েছিল নেপাল ও সিকিমের মধ্যে। ওই চুক্তি অগ্রাহ্য করে ১৭৭৬ সালের আক্রমণ। পরিবেশ অশান্ত হয়ে ওঠে। সিকিমের সেনাপতি চানজক নেপালকে কিছুটা প্রতিহত করলেও, খুব একটা সফলতা অর্জন করতে পারে নি।

১৭৮০ সালে নেপালের সামরিক কর্মচারী গঙ্গারাম থাপা পূর্ব মোরাঙ আক্রমণ করে দখল নিয়েছিলেন। নেপাল, সিকিমের অম্লমধুর সম্পর্ক নিয়ে ব্রিটিশরা চিন্তিত ছিলেন না, কিন্তু নেপাল ও সিকিম সরকার যেভাবে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের এবং বৈকুণ্ঠপুরের রায়কতরাজ দর্পদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমকুমারকে নিয়ে মাতামাতি করছিল, ওই বিষয়টি ব্রিটিশদের শঙ্কিত করে তুলতে থাকে। (রংপুরের কালেক্টরের পত্র নং ১৫০, তাং ২৭.১১.১৭৮১)। হেস্টিংস ফক্সক্রস্টের নেতৃত্বে নেপালে একটি মিশন পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ওই বছরেই তিনি স্বদেশে চলে যাওয়ায়, ওই মিশন পাঠানো আর ফলপ্রসু হয়নি।

ব্রিটিশদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে ভুটান রংপুরে বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপনের জন্য উভয় জনপদের মধ্যবর্তী বৈকুণ্ঠপুর ও কোচবিহারে একটি করিডোর প্রার্থনা করে। ব্রিটিশ কোম্পানি ১৭৭৪ সালে বৈকুণ্ঠপুরের ৭৭টি মৌজা ও কোচবিহারের কিছুটা অংশ ভুটানকে উপহার দিয়ে দেয়। ফলে, শিলিগুড়ির নিকটবর্তী আমবাড়ি ফালাকাটা, ক্রান্তি, জল্পেশ, ভোটপট্টি এবং কোচবিহারের চেচাখাতাসহ বিস্তীর্ণ ডুয়ার্স ভুটানের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। বৈকুণ্ঠপুরের রাজা দর্পদেব রায়কত সন্ন্যাসী ও ফকিরদের পরোক্ষ সাহায্য নিয়েও তাঁর রাজ্যের অংশের ওই ৭৭টি মৌজা পুনরায় দখলে আনতে পারেন নি। ফলে সমগ্র ডুয়ার্স এলাকা ভুটানিদের ব্যবসা-বাণিজ্য সহ লুঠপাটের একটা মুক্তাঞ্চল হয়ে ওঠে। শুধু ধনসম্পদই নয়, বহু নরনারীকে বলপূর্বক ভুটানে নিয়ে যাওয়া হতে থাকে।

১৭৯০ সালে চিন-নেপাল যুদ্ধে ব্রিটিশ কোম্পানি হয়ত নেপালের প্রতি বিরক্ত হয়েই নিরপেক্ষ অবস্থান নীতি গ্রহণ করেছিল। ১৮১৪ সালের ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধেই তা প্রমাণিত হয়। পরের বছর পূর্বে মোরাঙের দখল নেয় ইংরেজরা। গুগেটলির সন্ধি সাক্ষরিত হয় ১৮১৫ সালের ২৪শে নভেম্বর।

১৮১৭ সালের ১০ ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব মোরাঙ কে সিকিমের হাতে অর্পণ করে ব্রিটিশ কোম্পানি সিকিমকেও হাতের মুঠোয় ভরে নিয়েছিল। ভুটান তো আগেই ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল। তেঁতুলিয়ায় বসে ইঙ্গ-সিকিম চুক্তি ইতিহাসের নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করে। বহুদিনের লালিত তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যিক স্থাপনের জন্য করিডোর স্থাপনের পথটি এতদিনে সুগম হয়ে ওঠে। কিন্তু, ডা. ক্যাম্বেল ও স্যার যোশেফ ডাল্টনকে সিকিমে বন্দি করা হলে ওই সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে। ব্রিটিশদের স্বপ্নপূরণের ক্ষেত্রে একটা বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়।

হেস্টিংস জর্জ বোগলকে তিব্বতে পাঠিয়েছিলেন সেখানকার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবার জন্য। নেপালের তা পছন্দ ছিল না। নেপাল চেয়েছিল যে, সিকিম কিংবা তিব্বতের সঙ্গে ব্রিটিশদের বাণিজ্যিক লেনদেন নেপালের করিডোরের মাধ্যমে সম্পন্ন হোক। এতে উপকৃত হবে নেপাল। নেপালের তিব্বত আক্রমণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা ওই চেতনা থেকেই ঘটে থাকতে পারে।

আর তিব্বতের উপর আক্রমণে সতর্ক হয়ে উঠেছিল চিন। চিন তিব্বতে সেনা পাঠিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল। অবশ্য তারও একটা উদ্দেশ্য ছিল। চিন চেয়েছিল তিব্বতে চিনা বাণিজ্যের পথকে সুগম করতে। নেপাল ওই সময়ে কোম্পানির সাহায্য চেয়েছিল, কিন্তু পায়নি। লর্ড কর্ণওয়ালিস তখন নিরপেক্ষ থাকার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য মহাশক্তিধর চিনের মোকাবিলা করবার শক্তি ও সাহস এই সময়ে কোম্পানিরও ছিল না।

তিব্বতের সঙ্গে সিকিমের সৌহার্দ ছিল বহুদিনের। কিন্তু, মাঞ্চু প্রশাসনের বিরুদ্ধে তাইপিং বিদ্রোহ চিনকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল। ওই সুযোগটাই গ্রহণ করেছিল নেপাল। নেপালের তিব্বত অভিযান ওই মুহূর্তটিকে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। নেপাল-তিব্বত যুদ্ধ যেমন চিনকে সতর্কিত করে, তেমনই সতর্ক করে দেয় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকেও।

দার্জিলিং থেকে তিব্বতের লাসার দূরত্ব কমবেশি ২৫০ মাইল। সিকিমের রাজার সঙ্গে মি. ইডেনের নেতৃত্বে চুক্তি হয়েছিল ১৮৬১ সালে। ওই চুক্তির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অন্ততঃপক্ষে লাসার সঙ্গে দার্জিলিংয়ের একটা সংযোগ সড়ক গড়ে উঠুক। ওই সড়কপথ ভবিষ্যতে তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক হয়ে উঠবে। সিকিম সরকার ওই সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং সড়কের পাশে গড়ে তুলবে বেশ কিছু পান্থনিবাস।

অবশ্য ওই স্বপ্নের সড়কপথটি নির্মাণে প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠেছিল দুর্গম গিরিপথ। আড়াইশ মাইলের সড়কপথটি বাস্তবায়িত করতে হলে কমপক্ষে ৬০০ মাইলের পাহাড়ি পথ নির্মাণের প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। তাই ওই দুর্গম গিরিপথ বাস্তব কারণে নির্মাণ করা আর সম্ভব হয়ে ওঠে নি। কিন্তু, তাই বলে, ব্রিটিশ কোম্পানির তিব্বতে বাণিজ্য করবার আকর্ষণ কিন্তু কমে নি।

১৮৫৩ সালে মি. ওয়েলবি জ্যাকসন দার্জিলিং প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, তিব্বতি ভেড়ার পশম এতই উৎকৃষ্ট মানের যে ইংল্যান্ডের মেরিনো ভেড়ার উৎকৃষ্ট পশমের সঙ্গেই সেটির তুলনা চলে। বিশ্বের ধনী সমাজে তিব্বতি ভেড়ার পশম ও পশমজাত পোশাকাদির চাহিদা হয়ে উঠবে ব্যাপক— এমনটাই ব্রিটিশ বণিক কোম্পানির অভিমত। তাই তিব্বতি বাণিজ্য প্রয়োজন।

সার্জন রেনীর বর্ণনায় তিব্বত ঃ

তিব্বতকে বলা হয় পু-কোয়াচিম অর্থাৎ উত্তরের বরফের দেশ। এখানকার কিছু অধিবাসী পোট, বোদ, বোদ উল নামে পরিচিত ছিল। বোদরাই ভোট নামে ছিল তিব্বতে পরিচিত। ভুটানের প্রাথমিক পর্যায়ের শাসকদের মধ্যে ডুপগেন সেপটুন ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রজানুরঞ্জক রাজা। তাঁর আমলে আন্দু ফোরাঙ, পুনাখা, পারো, দুর্গগুলি গড়ে ওঠে। তিনি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রজারা স্বতস্ফূর্তভাবে উৎপাদিত ফসলের একটা অংশ রাজস্ব হিসেবে দানে রাজি হলে, ডুপগেন সেপটুন সেটিকে স্বীকৃত দিয়েছিলেন। তিনি প্রদেশের শাসনকর্তা হিসেবে পেনলো এবং দুর্গের রক্ষক হিসেবে জুঙপেন-য়ের পদ সৃষ্টি করেন ও রাজক্ষমতার দায়িত্ব বন্টন করে দেন। ডুপগেন সেপটুন এতটাই প্রজাপ্রিয় ও কল্যাণকামী ছিলেন যে, সমাজে তিনি ধর্মরাজা নামে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে ধর্মরাজার দেওয়নকে দেবরাজা নামে মান্যতা প্রদান করা হত। আধ্যাত্মিক শাসক ধর্মরাজা ও পার্থিব শাসক দেবরাজা সমাজে স্থায়ী আসন লাভ করেন।

পুনাখা দুর্গে ধর্মরাজা ডুপগেন সেপটুনের মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়েছিল। ওই সমাধিতে প্রতিদিন খাদ্য, পানীয় প্রদান করা হয়ে থাকে। তাঁর প্রয়াণের তিন বছর পরে লাসার এক শিশুকে ধর্মরাজা বলে চিহ্নিত করা হয়। তিনিই হন পরবর্তী ধর্মরাজা। কারণ, ধর্মরাজার মৃত্যু নেই, মৃত্যু নেই দলাই লামারও। লন্ডনের বণিক র‍্যালফ ফিচ ১৫৮৩ সালে ভুটানের বর্ণনা করে, চিন-ভুটান

ও বাংলার ব্যবসায়িক সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছিলেন। ১৮৩৮ সালে ক্যাপ্টের পেম্বারটন ভুটানে মিশনের প্রতিনিধিত্বকালে জানান যে, তিব্বতি শাসককে ভুটানের দেবরাজা প্রতিবছর নজরানা দিয়ে থাকেন। তবে, ভুটান ওই নজরানা পাঠাতে কখনও ভুলে গেলে, তিব্বত কিন্তু তা মনে করিয়ে দেয় না। তবে, তিনি একথাও জানান যে, ভুটান কোনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলে, তিব্বত কিন্তু আর ভুটানকে সাহায্যও করে না।

মনোনয়ন ও নির্বাচন— ভুটানের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধারীকে দুটো পদ্ধতিতেই বেছে নেওয়া হয়। সুলক্ষণযুক্ত ঈশ্বর প্রেরিত কোনও ব্যক্তিকে কঠিন ও কঠোর পরীক্ষার মাধ্যমে ধর্মরাজা পদে মনোনীত করা হয়। কিন্তু, দেবরাজা নির্বাচিত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে। ভুটানের মন্ত্রীপরিষদ কোনও প্রধান রাজকর্মচারীকে দেবরাজা পদে নির্বাচিত করে থাকেন। তবে মি. অ্যাশলে ইডেনের সফরকালে জানা গিয়েছিল যে, প্রাদেশিক শাসনকর্তা অর্থাৎ পেনলোরা প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী হয়ে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে দুর্গের রক্ষক অর্থাৎ জুঙপেনবাও ক্ষমতাবান হয়ে ওই পদ অধিকার করবার জন্য যুদ্ধ করতেও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আবার দেবরাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাজক্ষমতা দখলের চেষ্টায় রত থাকেন অনেকেই। আবার ক্ষমতাবানেরা দেবরাজাকে পুতুলরাজায় পরিণত করতেও তৎপর থাকতেন। অংসো ও পারোর পেনলো তো যুযুধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে ছিলেন মরিয়া।

জুঙপেন, পেনলো, নেইবু— পেনলো হল প্রাদেশিক শাসককর্তা। জুঙপেন হলেন দুর্গের রক্ষক। জুঙ অর্থ হল দুর্গ এবং পেন অর্থ হল রক্ষক। অবশ্য তিনি শুধু দুর্গের রক্ষকই নন, দুর্গ অঞ্চলের শাসকও। এঁদের নিযুক্ত করেন প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা পেনলো। ফলে, কোন পেনলো ক্ষমতাচ্যুত হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবে নব নিযুক্ত পেনলো প্রতিটি দুর্গের জুঙপেনকে সরিয়ে দিয়ে নিজের মনোমত জুঙপেন নিযুক্ত করতে পারেন। এবং করেও থাকেন।

জুঙপেনের অধীনস্থ কর্মচারীরা 'নেইবু' নামে অভিহিত হন। তাঁরা জুঙপেনের সহকারী কর্মচারী। এঁরা সৈন্যবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন। পুলিশ বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেন নেইবুরা। ডালিমকোট দুর্গে নেইবুরাই কাঠাম নামে পরিচিত ছিলেন। (অবশ্য পরবর্তীকালে জানা যায় যে, কাঠামরা ছিলেন রাজস্ব সংগ্রহকারী ভুটানরাজের প্রতিনিধি। এঁরা সরকারি কাজের পারিশ্রমিকের বদলে আবাদ জমি ভোগদখলের অধিকারী ছিলেন।)।

ভাষা— ভুটানের ভাষার মাতৃভূমি হল তিব্বত। তিব্বতি ভাষা জননীর গর্ভেই ভুটানি ভাষা জঙ্খার উৎপত্তি। তবে, ভুটানের উত্তরাঞ্চলের ভাষা বিশুদ্ধ তিব্বতি। দক্ষিণাংশের ভাষায় মিশ্রিত হয়েছে অসমিয়া, কোচবিহারি ও বাংলা উপভাষাও। অবলীলাক্রমে মিশ্রিত ভাষা তৈরি হয়েছে সেক্ষেত্রে। দোভাষিয়া জনগোষ্ঠী কোচবিহারি ও জঙ্খার মিশ্রণে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকেন।

সৈন্যবাহিনী— ভুটানের নিজস্ব নিয়মিত সেনাবাহিনী নেই বললেই চলে। বিভিন্ন দুর্গে কয়েকশ' প্রহরীকে প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী বলা চলে না। তবে, যুদ্ধের সময়ে গ্রাম প্রধানেরা গ্রামের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তিকে যুদ্ধে পাঠিয়ে থাকেন। এঁরা যুদ্ধ শেষে আবার গ্রামে ফিরে যেতে পারেন। এঁদের জন্য প্রতিটি দুর্গে কিছু অস্ত্রশস্ত্র মজুত থাকে। তীর-ধনুক, পটকা, তরবারি, বড় চাকু, পাথর ছোড়ার গুলতি, গাদা বন্দুক ইত্যাদিই অস্ত্র। শিরস্ত্রাণ, রক্ষাবরণ ইত্যাদি সৈনিকদের বর্ম।

বোগল মিশন— ১৭৭২ সালে ভুটান কোচবিহারকে আক্রমণ করেছিল। কোচবিহারের মহারাজা নাবালক ধরেন্দ্রনারায়ণকে পরাজিত করে সমগ্র কোচবিহার ভুটানরাজ দেবযধুর নিজ দখলে নিয়ে আসেন। বাধ্য হয়ে কোচবিহারের নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ক্যাপ্টেন জোন্স সসৈন্যে কোচবিহারে আসেন। ভুটান ফিরে যায় ও সন্ধির প্রস্তাব করে। অবশেষে ১৭৭৪ সালে উভয়পক্ষে সন্ধি হয়। চেচাখাতা, পাগলার হাট, ক্রান্তি, মরাঘাট ও লক্ষ্মীপুর ভুটানের দখলে চলে যায়। দেবরাজ চেচাখাতার দখলের বিনিময়ে প্রতিবছর পাঁচটি টাঙন ঘোড়া কোচবিহাররাজকে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। কোম্পানিকেও দেবরাজা কর দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। মহারাজ ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণকে ও তাঁর দেওয়ানকে মুক্তি প্রদান করা হয়। বন্দি বিনিময় হয়। এভাবে দশটি শর্তে চুক্তি সাক্ষরিত হয়।

ভুটিয়ারা গীতালদহ, বালাডাঙ্গা, মোওয়ামারি, মরাঘাট ও লক্ষ্মীপুরে দুর্গ নির্মাণ করেছিল। ভুটিয়া সেনাপতি কোচবিহারের রাজপ্রাসাদে বসবাস করতে শুরু করেছিল। রায়কতরাজ দর্পদেব ছিলেন ভুটিয়াদের পক্ষে। এরূপ শ্বাসরুদ্ধকারী পরিস্থিতি থেকে ওই শান্তিচুক্তির মাধ্যমে কোচবিহার স্বস্তি লাভ করেছিল সত্যি, কিন্তু কোচবিহার হারিয়েছিল সার্বভৌম স্বাধীনতা। কোম্পানির করদরাজ্যে পরিণত হয়েছিল কোচবিহার।

এভাবে যুদ্ধে পিছু হটার অপমানে ও ব্রিটিশদের চাপে ভুটান বাধ্য হয়ে তিব্বতি রাজার সাহায্যপ্রার্থী হতে বাধ্য হয়েছিল। তেসু লামা তখন তিব্বতের শাসনকর্তা, নাবালক দলাই লামার তিনি প্রতিনিধি মাত্র। তেসু লামা ভুটানের আব্দারে বাধ্য হয়ে ভারতের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে একটি চিঠি লিখে ভুটানের প্রতি আক্রমণ বন্ধ করতে অনুরোধ করেন। পূরণগির গোঁসাই নামে এক তীর্থযাত্রী ওই চিঠি নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলেন। ১৭৭৪ সালে ইঙ্গ-ভুটান শান্তি চুক্তি তারই ফলশ্রুতি। প্রকাশ থাকে যে ওই পূরণগির গোঁসাই পরবর্তীকালে ক্যাপ্টেন টার্নারের সঙ্গে তিব্বত মিশনের সহযাত্রী হয়েছিলেন।

তেসু লামার চিঠিটি ছিল কূটনৈতিক বাতাবরণে রচিত। চিঠিটির বহিঃরঙ্গে ছিল ভুটানের ঔদ্ধত্য, অন্যায় কাজকর্মের নিন্দা এবং তাঁর নিজস্ব শাস্তিবিধানের প্রতিশ্রুতি। যেহেতু তিনি ধর্মপথে প্রজাপালনে আগ্রহী, ওই মনোভাব পত্রের ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। পত্রটির অন্তরঙ্গে ছিল ভুটানকে ক্ষমা করা। ওই পত্র পাঠ করে গভর্নর জেনারেল তিব্বতে একটি মিশন পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। মি. জর্জ বোগল ছিলেন ওই প্রতিনিধিদলের প্রধান। তিনি অত্যন্ত যোগ্য ও অক্রোধী মানুষ ছিলেন।

আসলে গভর্নর জেনারেল তিব্বতের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করে ভুটান, তিব্বতেই শুধু নয়, কাশ্মীর ও চিন দেশের সঙ্গেও বাণিজ্য স্থাপনের চিন্তা করেছিলেন বলে মনে করা হয় (খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, কোচবিহারের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, সপ্তদশ পরিচ্ছদ)। কারণ, মি. বোগলের মিশনের সদস্য ছিলেন মির্জা মোহম্মদ সাত্তার নামে একজন কাশ্মীরি মুসলমান ও ডা. হ্যামিল্টন। হ্যামিল্টন অবশ্য পরে আর দু'বার ভুটানে প্রেরিত হয়েছিলেন ও ব্যর্থ হয়েছিলেন।

বোগল কমিশন ১৭৭৪ সালের ৬ই মে তিব্বত অভিযান করেছিলেন। তিনি প্রথমে কোচবিহার হয়ে ভুটানে ঢুকেছিলেন। তাঁকে ভুটানের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী তাশি জঙ-এ আটকানো হয়েছিল। তাঁর কাছে ভুটান সরকার পাশপোর্ট দাবি করেছিল। ফলে বোগল সেখান থেকে চলে যান ভুটান ও তিব্বতের সীমান্ত অঞ্চল ফাগ্রিতে এবং সেখান থেকে ১২ই অক্টোবর তিনি তেসু লামার রাজধানী দেশেরিপ-গে'তে হাজির হন। তিনি সেখানে ১৭৭৫ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ছিলেন ও মিশনকে সফল করতে সমর্থ হয়েছিলেন। (মি. বোগল ১৭৭৯ সালে পুনরায় তিব্বতে গিয়েছিলেন। প্রথমবার তিনি তিব্বতের রাজধানী লাসায় যেতে পারেননি। দলাই লামা অনুমতি দেন নি। পরবর্তী যাত্রায় তেসু লামা তিব্বতে ছিলেন না বলে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি। এবারের যাত্রায় তাই তিনি পূর্ণগির গোঁসাইকে নিয়ে চিনের রাজধানী পিকিং (বেইজিং গিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে তেসু লামার মৃত্যু হওয়ায় বোগল ব্যর্থই হয়েছিলেন বলা যায়।)

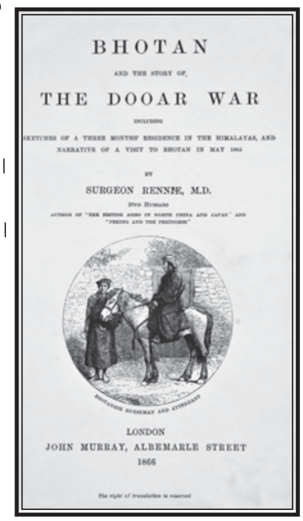
BHOTAN

AND THE STORY OF

THE DOOAR WAR

INCLUDING

SKETCHES OF A THREE MONTHS' RESIDENCE IN THE HIMALAYAS, AND NARRATIVE OF A VISIT TO BHOTAN IN MAY 1865

BY

SURGEON RENNIE, M.D.

LONDON

JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET

1866

টার্নার মিশন— ১৭৮০ সালের ৫ই জুলাই পিকিং সফরকালে গুটিবসন্ত রোগে মারা যান তেসু লামা। তেসু লামার মৃত্যুর পর সুপুন চুম্বুনামে তিব্বতের এক রাজপ্রতিনিধি ওয়ারেন হেস্টিংসকে ওই মৃত্যু সংবাদ দিয়ে শেষকৃত্যে উপস্থিত হতে একটি আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিলেন। ওই পত্র পড়ে ভারত সরকার তিব্বতে দ্বিতীয় একটি মিশন পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ওই মিশনের দায়িত্ব অর্পিত হয় বাংলার সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন টার্নারকে। তাঁকে ১৭৮৩ সালের ৯ই জানুয়ারিতে ওই মর্মে নির্দেশ পাঠানো হয়।

ক্যাপ্টেন টার্নারের নেতৃত্বে ওই মিশনের সদস্য ছিলেন বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের সার্ভেয়ার লে. ড্যাভিস এবং সার্জেন্ট রবার্ট স্যান্ডার্স। ওই দল কলকাতা থেকে রওনা হয়ে মুর্শিদাবাদ, রংপুর, কোচবিহার হয়ে ভুটানের সীমান্ত অঞ্চল চেচাখাতায় এসে পৌছন। সেদিন ছিল ১১ই মে

১৭৮৩ সাল। বক্সাদুয়ার হয়ে টার্নার সাহেব তাশি জঙ-এ পৌঁছেছিলেন ১লা জুনে। সেখানে ভুটানের কর্তৃপক্ষ তাশি লামার রিজেন্টের সঙ্গে তিব্বতে প্রবেশের অনুমতি আদায় করতে তিন মাস কেটে যায়। অবশেষে জানানো হয় যে তিব্বতে দু'জনের বেশি প্রতিনিধি পাঠানোর অনুমতি পাওয়া যায়নি। ফলে, লে. ড্যাভিসকে বাংলায় ফেরৎ পাঠানো হয়। অবশেষে তাশি লামার রিজেন্টের সঙ্গে ক্যাপ্টেন টার্নার ৮ই সেপ্টেম্বর রওনা দিয়ে তাশি লামার সাথে দেখা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

দীর্ঘ আলোচনার পর ব্যবসায়িক ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শর্তে উভয় দেশ সহমত হয়। সে মর্মে একটি রিপোর্ট তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক গভর্নর জেনারেল স্যার জন ম্যাকফারসনকে পাঠানো হয়েছিল। টার্নারের ওই চিঠি নিয়ে ১৭৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পূরণগির গোঁসাই পুনরায় কলকাতায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

অবশ্য ভুটান বা তিব্বতের সঙ্গে ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক বা ব্যবসায়িক ভাব বিনিময় সম্ভব হয়নি। হয়নি কোনও বাণিজ্য চুক্তি।

চিনের নেপাল দখল— চিনের সম্রাট কিয়েন-লাঙ্ নেপালের বিভিন্ন উপদ্রবের পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রতিনিধিদল নেপালে পাঠিয়েছিলেন। চিনের জনসাধারণের সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ চিন সম্রাট নেপালের কাছে পাঁচ লক্ষ দু'হাজার স্টার্লিং দাবি করেছিলেন। সুমহুর লামা নামে লাসার এক উজীরকে নেপালি সেনারা বন্দি করেছিল, চিন সম্রাট তাঁরও মুক্তি দাবি করেছিলেন। চৈনিক সম্রাটের দাবি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তিনি ৭০ হাজার সৈন্য নেপাল আক্রমণ করতে পাঠান। ওই সেনাবাহিনী নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর ২০ মাইল অদূরে পৌঁছে যায়।

বিধ্বস্ত নেপালের রাজা আত্মরক্ষার জন্য ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশের শরণাপন্ন হন। ওদিকে তিব্বতের দলাই লামা ভারত সরকারকে অনুরোধ করেন যে, নেপালকে যেন কোনও সাহায্য না করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে লর্ড কর্ণওয়ালিশ নেপালকে জানান যে, চিকিৎসা পরিষেবা ছাড়া তিনি আর কোনওভাবে নেপালকে সাহায্য করতে পারবেন না। ফলে নেপাল বাধ্য হয়ে চিন সম্রাটের কাছে আত্মসমর্পন করে।

চিন, নেপাল ও তিব্বতের সঙ্গে ব্রিটিশ কোম্পানি এমনই রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চললেও, মূল লক্ষ্য যে ভুটান ও তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন— ওই প্রচেষ্টা কিন্তু অব্যাহত থাকে। ১৭৯২ সালে ভারত সরকার পুনরায় ভুটানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

বিজনী রাজ্যে গন্ডগোল— কোচবিহার রাজবংশের শরিকেরাই ছিলেন বৈকুণ্ঠপুর, বিজনী, সিডলি, পাঙ্গার শাসক। একই সময়ে অসমের বিজনী রাজ্যের রাজা নবীন্দ্রনারায়ণ নিহত হলে রাজসিংহাসন শূন্য হয়ে পড়ে। এতদিন ধরে বিজনী রাজ্যটি ভুটান ও কোচবিহারের রাজার প্রশ্রয়ে সুরক্ষিত ছিল। ভুটানের দেবরাজা বিজনী শূন্য সিংহাসনে তাঁর মনোনীত এক প্রার্থীকে বসাতে সমর্থ হয়েছিলেন। ভারত সরকার ভুটানের এভাবে বিজনী রাজ্যের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ করবার বিষয়টি সমর্থন করতে না পারলেও, নবনির্বাচিত রাজাকে মান্যতা দিয়েছিলেন। শুধু ভুটানকে খুশি রাখাই ওই সময়ে ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

কৃষ্ণকান্ত বসুর দৌত্য ও ফলশ্রুতি— রংপুরের বিচারক মি. ডেভিট স্কট তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী বাবু কৃষ্ণকান্ত বসুকে ভুটানের দেবরাজার কাছে দূত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। প্রধানত ভুটান ও বাংলা সীমান্তের সীমানা চিহ্নিতকরণ নিয়ে উদ্ভুত কিছু সমস্যা ও বিতর্ক সমাধানের উদ্দেশ্যেই ছিল ওই দূত প্রেরণ! অবশ্য ভারত সরকারের সম্মতি নিয়েই মি. ডেভিট স্কট ওই দূত পাঠিয়েছিলেন।

বাবু কৃষ্ণকান্ত বসু অসমের গোয়ালপাড়া, বিজনী, সিডলি, চিরাং হয়ে পাচু-মাচু নদী পেরিয়ে পুনাখায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন। কৃষ্ণকান্তবাবু ওই সময়ে ভুটানের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তা এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষকেরা অনুবাদ করে ১৫টি খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু, কৃষ্ণকান্ত বসু ভুটানে এক বছরের মত সময় কাটাতে বাধ্য হলেও সীমান্ত সমস্যার কিন্তু সমাধান করতে পারেন নি। অবশ্য সার্জন রেনী কৃষ্ণকান্তের বিবরণের মধ্যে কোনও সারবত্তা খুঁজে না পেলেও, ভুটানের অভ্যন্তরীন চিত্রগুলি কিন্তু ধীরে ধীরে ব্রিটিশদের চোখে ধরা পড়তে থাকে।

ব্রিটিশ, ভুটান, অসম ও ডুয়ার্স কেন্দ্রিক সম্পর্ক— বর্মা অসমকে দখল করে নিলে ভয়ে ভীত অসমিয়ারা পালাতে থাকে ও অসম প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। সীমান্ত প্রদেশের গন্ডগোল নিবারণের জন্য ব্রিটিশ সরকার বর্মাকে হটিয়ে দিয়ে অসমের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেয়। ওই সময়ে নিম্ন অসমে স্থানীয় রাজারাও ঠিক মত শাসন করতে পারছিলেন না। অসমের রাজাদের সঙ্গে, বিশেষত ভুটানের সঙ্গে ব্রিটিশদের সুসম্পর্কই ছিল। ক্যাপ্টেন পেম্বারটনের রিপোর্ট থেকেও অসম সম্পর্কে বিশদ বিবরণ জানা যায়।

'তিন দিকে পর্বতে ঘেরা অসম উপত্যকায় নানা উপজাতির রাজাদের শাসন ছিল দুর্বল। ফলে, চারদিকে নানা গোলযোগ লেগেই থাকত। ওই সুযোগে আভাদের মত নিষ্ঠুর হানাদারেরা তাদের ক্ষমতা বিস্তার করতে থাকে। পর্বতের পাদদেশে বিস্তৃত সমতলভূমি দখল করে ওরা শাসন করতে থাকে। ফলে, অসমের রাজাদের সঙ্গে ওই সব উপজাতির হানাদারদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু অসমরাজের এমন ক্ষমতা নেই যে, ওই আগন্তুক হানাদারদের হটিয়ে দেশের নিরাপত্তা বজায় রাখতে পারে। ওই উপজাতিয় হানাদারেরা পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে হঠাৎ সমতলে লুন্ঠন চালিয়ে শাসন ও শোষণ করত। রাষ্ট্রশক্তির আঘাত নেমে আসার সম্ভাবনা দেখলে আবার পাহাড়ে পালিয়ে যেত। এভাবেই পাহাড় থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের সমতলভূমি পর্যন্ত তাদের অত্যাচার লেগেলেই থাকত।'

অবশ্য ভুটানিরাও একই কায়দায় ভুটান থেকে এসে অসম ও কোচবিহারের এবং ডুয়ার্সের সমতলভূ মিতে লুটতরাজ চালাত।

ডুয়ার্স হিমালয়ের পাদদেশে এমন একটি সমতলভূমি যা দৈর্ঘে ২২০ মাইল এবং প্রস্থে ৩০ মাইলের মত। অবশ্য এর মধ্যে তরাইয়ের বিস্তৃত আরণ্যক অঞ্চল ধরা হয়নি। পাহাড়ের সানুদেশ বলে এটি অসমান এবং পাহাড়ি বর্জ্য পদার্থে বেশ উর্বর। ডুয়ার্সের আরণ্যক অঞ্চলে হাতি, গন্ডার, বাঘ, হরিণ, বুনো মহিষদের এবং অন্যান্য বিচিত্র পশুপাখিরা মুক্তভাবে জীবন কাটায়। ডুয়ার্সের দক্ষিণাংশ কালো মৃত্তিকার জন্য উর্বর। ধান, তুলো, তামাক ওই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। ভুটানের প্রয়োজনীয় তামাক ডুয়ার্স থেকেই সংগৃহীত হয়।

তবে ডুয়ার্সের আবহাওয়া ভাল না হওয়ায় অস্বাস্থ্যকর। ম্যালেরিয়ার মত মারাত্মক অসুখে বিসুখে আক্রান্ত হন সবাই। এখানকার জনজাতিগুলির মধ্যে অন্যতম হল মেচ সম্প্রদায়। ভুটানিরা ডুয়ার্সকে বর্ষাকালে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে থাকে।

আঠার দুয়ার— ডুয়ার্সের আঠারটি দুয়ারের মধ্যে এগারটি দুয়ার বাংলার সীমান্তে এবং সাতটি দুয়ার অসম সীমান্তে। তবে অসমের দুয়ারগুলি অসমের সম্পত্তি হলেও, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে ভুটানের দখলে ও নিয়ন্ত্রণে। ওই দুয়ারগুলি থেকে ভুটানিরা বার বার অসমের রাজাকে বিব্রত করত। ক্যাপ্টেন পেম্বারটন জানিয়েছেন যে, অসমরাজ তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশ্য ভুটানরাজ ওই দুয়ারগুলির দখলদারির জন্য অসমরাজকে প্রতিবছর চমরি গাইয়ের লেজ, মৃগনাভি, স্বর্ণরেণু, টাট্টু ঘোড়া, কম্বল, ছুরি সহ প্রায় ৪,৭৮৫ নারায়ণী মুদ্রার সমপরিমাণ জিনিসপত্র উপহার দিতেন।

অসম ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে আসবার পর ভুটানের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্কে ফাটল ধরলেও, খুব ঠান্ডা মাথায় ব্রিটিশরা ভুটানের সঙ্গে ডুয়ার্স নিয়ে আলাপ আলোচনা চালাতেই থাকে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি কিছুটা অনুধাবন করা যেতে পারে। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে স্থির হয় দরং দুয়ারের নিয়ন্ত্রণ এবার ভাগাভাগি হবে। ওই দুয়ারের দখল ব্রিটিশদের হাতে থাকবে জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ও ভুটানের নিয়ন্ত্রণে থাকবে ডিসেম্বর থেকে জুন মাস পর্যন্ত। অসমের বাকি দুয়ারগুলি আপাতত ভুটানের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে। ফলে, অসম সীমান্ত অঞ্চলে ভুটিয়ারা অবাধে নিজেদের প্রতিপত্তি বিস্তার করতেই থাকে।

অনুরূপ আর একটি ঘটনা উল্লেখ করবার পূর্বে ১৮ দুয়ার সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে। আঠার দুয়ারের নাম নিয়ে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। ড. অরবিন্দ দেব তাঁদের গবেষণা গ্রন্থেও মতান্তর ঘটিয়েছেন। সম্প্রতি একটি বিখ্যাত পত্রিকায় এক মহিলা ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের দিকে এগারটি ও অসম সীমান্তে ছ'টি মোট ১৭টি দুয়ার। প্রথম তালিকায় ডালিমকোট, সামসি, লক্ষ্মী দুয়ার, মাদার, গোমা, রেপু, সিদলি, জামেরকোট, বান্না, ছোটো বিজনী, বক্সাদুয়ার এবং দ্বিতীয় তালিকায় ছিল বিজনী, চাপাগুড়ি, গুড়গুড়াইয়া, খালিং, বুড়িগোমা এবং কুরিয়াপাড়া।

এক্ষেত্রে আসলে ইডেনের প্রদত্ত তালিকাটি নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি বেঙ্গল ডুয়ার্সে এগারটি, অসমের দরং জেলায় দুটি এবং কামরূপ জেলায় পাঁচটি মোট আঠারটি দুয়ারের নাম তালিকাভুক্ত করেছিলেন। বেঙ্গল ডুয়ার্সের এগারটি দুয়ার হল— (১) ডালিমকোট (২) জামেরকোট (ময়নাগুড়ি) (৩) চামুর্চি (সামচি) (৪) লক্ষ্মীদুয়ার (৫) বক্সাদুয়ার (পুনাখা) (৬) ভল্কাদুয়ার (৭) বড় দুয়ার (৮) গুমের দুয়ার (৯) রেপুদুয়ার (১০) চেরাংদুয়ার (১১) বাঘদুয়ার (ছোট বিজনী)। দরং

জেলার দুয়ার দুটির নাম (১) বুড়ি গোমা ও (২) কালিং। কামরূপ জেলার পাঁচটি দুয়ার হল (১) শুরখোলা (২) বাস্কা (৩) চাপাগুড়ি (৪) চাপকাহামা (৫) বিজনীদুয়ার।

এই দুয়ারগুলি দিয়ে অসমে ও বাংলায় সমতলে ভুটানিদের দৌরাত্ম্য ওদের জীবনধারণের জন্যই দ্রুত বাড়তে থাকে। কোম্পানির অধিকৃত এলাকাতে চলতে থাকে অত্যাচার ও লুণ্ঠন। সন্ধি, মৈত্রীচুক্তি, সরকারের দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতি— সবকিছুই হয়ে ওঠে গৌণ।

চুক্তিবিরোধী অসৎকার্যে লিপ্ত হয়ে ওঠেন ভুটানের স্থানীয় আধিকারিকরাও। ভুটান-অসম সীমান্তের সর্বাপেক্ষা পূর্ব প্রান্তে ছিল বুড়ি গোমা দুয়ার। ইঙ্গ-ভুটান মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের (১৭৭৪) পরবর্তী সময়ে ওই দুয়ারের রক্ষক ছিলেন ডুম্পা রাজা।

ভুটানের কিছু প্রজা ভুটান থেকে পালিয়ে এসে অসমের ছাগগাড়ি এলাকায় বসবাস করতে থাকেন। ১৮২৮ সালের ২২শে অক্টোবর ডুম্পা রাজা অসম থেকে ওই প্রজাদের ধরে আনেন। আবার অসমের যে প্রজারা ওদেরকে আশ্রয় দিয়েছিল, তাদেরকেও ধরে নিয়ে আসেন ও অত্যাচার করতে থাকেন। অসমের পুলিশ সুপার থানে মোহরার একটি চিঠি দিয়ে ডুম্পা রাজাকে অসমের অধিবাসীদের ছেড়ে দিতে বলেন এবং সীমান্ত চৌকিতে আটজন সিপাহীকে ঘটনার তদন্ত করতে পাঠান।

ডুম্পা রাজা ওই আটজন সিপাহীকে ধরে নির্দয়ভাবে প্রহার করেন ও কয়েকজনকে হত্যা করেন। আবার তিনি অসমে অনধিকার প্রবেশ করে বেশ কয়েকজন নারী পুরুষকে অপহরণ করে নিয়ে আসেন। প্রতিবাদে কোনও ফল হয়নি।

অসমে অবস্থিত গভর্নর জেনারেলের এজেন্ট সবকিছু জানিয়ে ভুটানের দেবরাজকে চিঠি লিখে ডুম্পা রাজার শাস্তি এবং অপহৃতদের মুক্তি দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাতেও কোনও কাজ না হওয়ায় কোম্পানির প্রতিনিধি বুড়ি গোমা দুর্গ হঠাৎ আক্রমণ করে নিজেদের দখলে নেন ও বন্দিদের মুক্ত করেন। ভুটান সরকার তিন বছরেও ওই দুর্গ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে নি।

১৮৩১ সালে ভুটানের দেবরাজা পূর্বের চিঠিটির উত্তর দিয়ে জানিয়েছিলেন যে ডুম্পা রাজা আর ইহলোকে নেই। তাই বুড়ি গোমা দুর্গটি যেন ভারত সরকার ভুটানের কাছে ফিরিয়ে দেন।

অসমে অবস্থিত ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধিকে ভারত সরকার ভুটানের দেবরাজার বক্তব্যের যথার্থতা যাচাই করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু ভুটানের দেবরাজা ওই পরিপ্রেক্ষিতে ডুম্পা রাজা যে মৃত, তেমন কোনও নথি দেখাতে পারেননি। ভারত সরকার নিহত ব্যক্তিদের পরিবারকে মাথাপিছু দু'হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করলেও, দেবরাজা কানাকড়িও দেন নি।

অসমের ডুয়ার্স নিয়ে তো ভুটানের সঙ্গে বিরোধ শুরু হয়েছিল ব্রিটিশদের অসম দখলের পরে পরেই। ব্রিটিশ সরকার সেজোয়াল নামে কর্মচারীদের ভুটানি রাজস্ব বাবদ প্রদেয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করবার জন্য নিযুক্ত করেছিল। ভুটানিরা অভিযোগ তোলে, ওই সেজোয়ালরা ভুটানি দ্রব্যাদির মূল্য কম ধার্য করে বেশি বেশি জিনিসপত্র সংগ্রহ করত।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে অশান্তির সূত্রপাত ঘটে। প্রতি বছর ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ কমতে থাকে। বিপরীতপক্ষে ভুটিয়াদের উপর করের বোঝা বাড়াতে থাকে সরকার। নিলামে দ্রব্যাদি বিক্রি ভুটিয়াদের উপর করের বোঝা বাড়াতে থাকে সরকার। নিলামে দ্রব্যাদি বিক্রি করতে গেলে ন্যায্য দাম পেতেন না ভুটানবাসী। এদিকে সীমান্তের দুয়ারগুলিতে কী ঘটনা ঘটছে ওই সংবাদও ঠিক মত পৌঁছাত না দেবরাজার কাছে। সীমান্তে ভুটানি অত্যাচার ক্রমাগত বাড়তেই থাকে।

এসব সমস্যা দূরীকরণের জন্য উভয় সরকারের মধ্যে আলাপ আলোচনা দরকার। এ জন্যই ব্রিটিশ সরকার ১৮৩৮ সালে ক্যাপ্টেন পেম্বারটনকে ভুটানে দূত হিসেবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

পেম্বারটনের দৌত্য— ক্যাপ্টেন পেম্বারটনকে ভুটানরাজ সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে যে উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল, তা সফল হয় নি। ব্রিটিশ সরকার অসম দখল করায় ভীত ছিল ভুটানরাজ। অবশ্য ভুটানের যাতে কোনও ক্ষতি না হয়, সেজন্যে বাৎসরিক দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকার করেছিল ব্রিটিশ সরকার। ১৮৪১ সালে এ নিয়ে ব্রিটিশ-ভুটান চুক্তি হয়েছিল। ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন অসমে ভুটানি অত্যাচার বন্ধ করতে রাজিও হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব ঘটনা তেমন হয় নি।

একই ঘটনা ঘটেছিল বৈকুণ্ঠপুর সীমান্তেও। ১৭৭৩ সালে রায়কত রাজ দর্পদেবের বৈকুণ্ঠপুর রাজ্য থেকে ব্রিটিশ সরকার ৭৭টি মৌজা ভুটান রাজকে উপহার দিয়েছিল। ১৭৮৪ সালে ব্রিটিশ সরকার আমবাড়ি-ফালাকাটা নিজেদের দখলে নিয়ে এসে ভুটানরাজকে ওই বাবদ কর দিতে রাজি হয়েছিল।

ভুটানরাজ কর পেলেও, বাংলা ও অসম সীমান্তে কিন্তু ভুটানি উপদ্রব কমে নি, বরঞ্চ প্রতিবছর তা বেড়ে যেতে থাকে। প্রতিবছর যেন ভুটানি উপদ্রব নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। ডাকাতি, লুণ্ঠন প্রভৃতি কাজে ভুটানি আধিকারিককেরাও জড়িয়ে পড়েন। ভুটানরাজকে বারবার ঘটনাবন্দি জানালেও, কোনও ফল পাওয়া যাচ্ছিল না। তিক্ত বিরক্ত হয়ে ব্রিটিশ সরকার আমবাড়ি-ফালাকাটার রাজস্ব বাবদ প্রদেয় কর বন্ধ করে দেবার হুমকিও প্রদান করে। কিন্তু ফল হয় নি।

এরূপ পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার একজন সরকারি প্রতিনিধির নেতৃত্বে একটি দল ভুটানের দেবরাজের দরবারে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ওই কমিশনের নাম ইডেন কমিশন।

ইডেন কমিশন প্রেরণের প্রেক্ষাপট— ১৮৬৩ সালে মি. অ্যাশলে ইডেনের নেতৃত্বে শান্তি কমিশন প্রেরণের প্রস্তুতি ও প্রেক্ষাপট, এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। লর্ড ক্যানিং তখন ভারতের বড়লাট। তাঁর বিদেশ মন্ত্রকের সচিব কর্ণেল ডুরান্ড ১৮৬২ সালের ২৩শে জানুয়ারি বাংলা সরকারকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। ওই চিঠিতে বলা হয়েছিল—

'ব্রিটিশ কাউন্সিল আমার কাছে এ ইচ্ছা প্রকাশ করেছে যে, ভুটানে একটা শান্তি মিশন পাঠানো যুক্তিযুক্ত। ওই মিশন সেখানে গিয়ে আমাদের দাবিসমূহ জানাবে, আমরা কী করতে পারি তা বলবে। অবশ্য যদি তারা আমাদের অভিযোগগুলি সত্য বলে স্বীকার না করে তবেই আমাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবে। ভুটানকে ওই মিশন পরিষ্কারভাবে জানতে চেষ্টা করবে সিকিমের সঙ্গে আমাদের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে ওদের মতামত কী। কিন্তু মহামান্য কাউন্সিল এটা মনে করেন না যে, ভুটানের সংসদে ব্রিটিশ সরকারের কোনও রাজপ্রতিনিধিকে অধিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে। মিশনের সাফল্যর পর ওই বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।'

লর্ড ক্যানিং উল্লেখ করেন যে, অসমে ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি মেজর হপকিনসনকে কলকাতায় ডেকে পাঠাতে হবে। মিশনের নিরাপত্তার জন্য তিনি কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন, কী পরামর্শ দিতে পারেন, তা জানতে হবে।

একই সময়ে সিকিমে ভুটানি হানা ঘটতে থাকে। ভুটানের ধারণা হয়েছিল যে, সিকিমের যোগসাজসে ব্রিটিশ সরকার আমবাড়ি-ফালাকাটা দখল করে নিয়েছে। ডালিমকোটের জুঙপেন ভুটানি হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তারা সিকিমের ৩০ জন নরনারী ও ২৩টি গবাদি পশু লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। পশুগুলির মূল্য ৪৯৫ টাকার মত। ১৮৬২ সালের জানুয়ারিতে ওই ঘটনা ঘটেছিল। পরের মাসেই কোচবিহার সীমান্তেও ভুটানিরা ব্যাপক লুঠতরাজের কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়েছিল। কোচবিহারের মহারাজার বহু তালুক ভুটানি আক্রমণে জনশূন্য হয়ে যাচ্ছিল। কোচবিহার অবশ্য ১৭৭৩ সালে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে গিয়ে ভুটানি হানাদারি বন্ধে অনেকটাই সাফল্য পেয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে হানাদারি, উপদ্রব ইত্যাদি ক্রমেই বেড়ে চলছে। কোচবিহার সংলগ্ন ডুয়ার্স এলাকা হয়ে উঠেছে জনশূন্য।

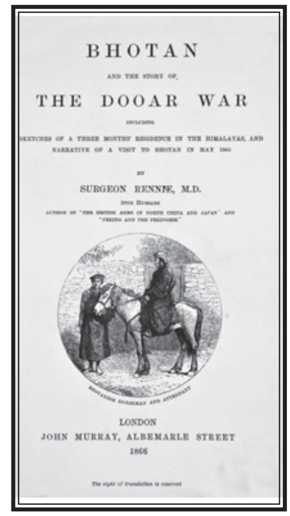

এদিকে দার্জিলিং জেলাতেও ভুটানি হানাদারি শুরু হবার উপক্রম। ভুটিয়ারা তিস্তা নদী অতিক্রম করে দার্জিলিং সীমানায় প্রবেশের চেষ্টা করছিল, জলপাইগুড়ি থেকে একদল সেনা এনে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এ সবেরই প্রেক্ষিতে ভুটানে শান্তি মিশন পাঠানোর বিষয়টি মোটামুটি ভাবে স্থির হয়ে গেলে ১৮৬২ সালের জুলাই মাসে মুকুন্দ সিং নামে একজন লোককে অসম হয়ে দেবরাজার দরবারে সংবাদবাহক হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। তার হাত দিয়ে একটা চিঠি পাঠিয়ে বলা হয়েছিল যে, ভারতের গভর্নর জেনারেল অতি শীঘ্রই ভুটানে একটি শান্তিমিশন পাঠাবে। উভয় সরকারের মধ্যে যে সব বিষয় নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, কমিশন সে সব ব্যাখ্যা শুনে ও নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে সমাধানসূত্র খুঁজবার চেষ্টা করবে। পত্রে একথাও বলা হয়েছে যে, মিশন কোন পথ ধরে ভুটানে প্রবেশ করবে, তা যেন ভুটান সরকার স্থির করে দেয় এবং একই সঙ্গে রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছানোর যাবতীয় আয়োজনের

ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে।

সীমান্তের ভুটানি আধিকারিকদের বাধায় সংবাদবাহক মুকুন্দ সিংহ কিন্তু যথাসময়ে কোচবিহারে ফিরে আসতে পারেননি। তাঁকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ভুটানেই আটকে রাখা হয়েছিল। যাওয়ার সময়ে চেরাঙ থেকে সাতদিন ধরে পায়ে হেঁটে তিনি পুনাখায় পৌঁছেছিলেন। প্রয়োজনীয় আতিথেয়তা ও অভ্যর্থনা মোটেই বন্ধুভাবাপন্ন ছিল না। শেষ পর্যন্ত দেবরাজা তাঁকে প্রত্যুত্তরে যে চিঠিটি দিয়েছিলেন, তা ছিল স্ববিরোধিতায় ভরা। সন্তোষজনক ছিল না সে পত্রটিও। চিঠির শুরুতে দেবরাজা লিখেছিলেন, 'আপনি এক সাক্ষাৎকার চেয়েছেন, ওটা ভাল। আমি আপনার সঙ্গে ডুয়ার্স নিয়ে কথা বলতে চাই।' তারপর তিনি একস্থানে লিখেছিলেন, 'সীমান্তের আধিকারিকদের নিয়ে আপনি যে সব বিবাদের কথা লিখেছিলেন, সে সবকে গুরুত্ব দিয়ে শোনার মত সময় ধর্মরাজার নেই এবং আপনার সাহেবরা (কর্মচারীরা) যদি তেমন অভিযোগ আপনাদের শোনাতে চায়, তবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সে সব শোনাও উচিত নয়।' মিশনের আগমন প্রসঙ্গে দেবরাজার বক্তব্য, 'আপনি সাক্ষাৎকার চেয়েছেন। কিন্তু এখন তা নানা সমস্যার দিকে ঠেলে দেবে। সামনে বর্ষা, রাস্তাঘাট এ সময়ে খারাপ। উপরন্তু ধর্মরাজা তেমন সাক্ষাৎকার প্রদানেও অনিচ্ছুক। আপনি যদি কোনও বিবাদ মেটাতে আসতে চান, তাহলে ঘটনাটা বলি, আমি ধর্মরাজকে কোনওকিছুই জানাই নি। আমি কয়েকজন জিনক্যাফকে আপনার কাছে পাঠাতে চাই। সঙ্গে আপনার লোকজনও থাকবে। তাঁরাই বিবাদ মিটিয়ে নেবেন। কিন্তু প্রচণ্ড গরমের জন্য আমি এখন তা করতে পারব না। মাঘ মাসের (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) দিকে আমি দু'জন বা তিনজন জিনক্যাফকে পাঠাব। তাঁরাই আমাদের নির্দেশ অনুসারে বিবাদ মিটিয়ে নেবেন।'

এরূপ চিঠি পেয়ে বাংলার লে. গভর্নর মি. সিসিল বীডন আর কালবিলম্ব না করে মিশন পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার মনে করেছিল, যেহেতু ভুটান কর্তৃপক্ষ মিশনের যাত্রাপথ ঠিক করে দেয় নি এবং জিনক্যাফদের পাঠাতে চেয়েছেন, তাই আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে, ওদের বক্তব্য শোনা দরকার। তাছাড়া শীতকালও তো এগিয়ে আসছে। সব মিলিয়ে আর কিছুদিন অপেক্ষা করাই ভাল।

জিনক্যাফরা কিন্তু আসেননি। কথা খেলাপের দরুণ এবং পত্রবাহক মুকুন্দ সিংহের কাছে প্রদত্ত চিঠির ছলনাময়ী বক্তব্যের দরুণ, ভারত সরকার এবার ভুটানরাজকে না জানিয়েই প্রস্তাবিত মিশনটি পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবশ্য এরূপ সিদ্ধান্তের ফলে, যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, ভারত সরকার জানায়, কমিশন তার নিজেদের পছন্দমত পথ ধরেই ভুটানে প্রবেশ করবে।

বাংলার সিভিল সার্ভিসের আধিকারিক মাননীয় অ্যাসলে ইডেন ওই দৌত্য কার্যের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। তিনিই একাজে যোগ্য ব্যক্তি। বছর দুয়েক আগে, সিকিমের রাজার সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল, তিনিই যোগ্যতার সঙ্গে ওই সমস্যার সমাধান ঘটিয়েছিলেন। সিকিমরাজ ও ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে সন্ধিচুক্তি তারই ফসল।

১৮৬৩ সালের ১১ই আগস্ট মি. ইডেন প্রস্তাবিত মিশনের নেতৃত্ব প্রদানের নির্দেশ পেয়েছিলেন। তাঁর বিবেচ্য বিষয়গুলি স্থির করে দেওয়া হয়েছিল।

প্রথমত ঃ অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণভাবে ও আন্তরিকতার সঙ্গে ভুটানকে বোঝানোর চেষ্টা করা হবে যে, কী পরিস্থিতিতে আমবাড়ি-ফালাকাটার দখল নেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। একই সঙ্গে ভুটানকে এটা জানিয়ে দেওয়া হবে যে, কেন ভুটানকে ওই স্থানের রাজস্ব প্রদান বন্ধ করে দেওয়া ছিল এবং ভুটানকে জানানো হবে যে, ওই অধিকারও ভুটানের দাবি মত, ব্রিটিশ সরকার ত্যাগ করতে সম্মত হতে পারে এবং ওই জনপদটি ব্রিটিশদের হাতে প্রত্যর্পণ মেনে নিলে, ওই জনপদের দখল বাবদ প্রদেয় রাজস্ব ভুটান সরকারকে ব্রিটিশ সরকার প্রদান করতে সম্মত থাকবে।

দ্বিতীয়ত ঃ ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন কোচবিহার ও সিকিম থেকে যে সব অধিবাসীকে ভুটান বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিল এবং যে সব সম্পত্তি লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিল, তা প্রত্যর্পণ করতে হবে।

তৃতীয়ত ঃ ব্রিটিশ সরকারের ও কোচবিহারের যে সব প্রজা ভুটান সীমান্ত এলাকায় আক্রমণের দায়ে অভিযুক্ত, ওই অভিযোগ প্রমাণ করতে হবে। পরিস্থিতি দাবি করলে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চতুর্থত ঃ ব্রিটিশ সরকার ও ভুটান সরকার যৌথভাবে উভয়দেশের অপরাধীদের চিহ্নিত ও তালিকাভুক্ত করবার ও সন্তোষজনক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবার প্রচেষ্টা করবে।

পঞ্চমত ঃ ভুটান সরকারকে সম্পূর্ণভাবে সচেতন করে দিতে হবে যে, কোচবিহার ও সিকিম রাজ্য ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিরাপদে আছে। সেক্ষেত্রে ভুটান কর্তৃপক্ষের ওইসব এলাকায় কোনওরূপ আগ্রাসন প্রচেষ্টা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অবন্ধুসুলভ আচরণ বলে গণ্য করা হবে।

ষষ্ঠত ঃ যদি সম্ভব হয় তবে, বাংলা ও ভুটানের মধ্যে নিঃশুল্ক বাণিজ্যিক সুবিধা সুনিশ্চিত করে এবং একই সঙ্গে ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের নিরাপত্তা বিধানে উভয়পক্ষ সহমত পোষণ ও গ্রহণ করতে পারেন।

সপ্তমত ঃ দেশের প্রকৃতি পরিবেশ, জনসংখ্যা ও দেশীয় সম্পদ সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করতে উভয়পক্ষে সহমত হওয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

অষ্টমত ঃ যদি সম্ভব হয় এবং মিশন সাফল্যমন্ডিত হয়, তবে তা চুক্তি আকারে রূপায়িত করা এবং একই মর্মে উভয়পক্ষের খসড়া প্রস্তাব রচনা করতে সহমত হওয়া।

ভুটানের ধর্মরাজা, দেবরাজা এবং ভুটান দরবারের সদস্যদের কিংবা উপযুক্ত কোনও ব্যক্তিকে উপহার প্রদানের উদ্দেশে প্রয়োজনীয় সামগ্রি কেনার জন্য মি. ইডেনকে দশ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছিল। মিশনের যাত্রাপথ স্থির করে দিয়েছিল ভারত সরকার। দার্জিলিং থেকে যাত্রা শুরু করলে নানাবিধ সুযোগ সুবিধা। মালপত্র বহনকারী কুলি সংগ্রহের সুযোগ, পাহাড়ি যানবাহন সংগ্রহের সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। ভুটানি আধিকারিকদের উপর নির্ভর না করে মিশন স্বাধীনভাবে প্রয়োজনীয় সবকিছু সংগ্রহ করতে পারবে। তাই দার্জিলিং থেকে যাত্রারম্ভের পরামর্শ প্রদান করা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়। যাত্রারম্ভের প্রস্তুতি। আগামী সংখ্যায়

ধারাবাহিক প্রতিবেদন

শিলিগুড়ির কথা: তৃতীয় পর্ব

শিলিগুড়ি আমার শহর এই ভাবনা আজও দানা বাঁধে নি

সৌমেন নাগ

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি দুই শহর। বয়স তথা ইতিহাসের বিচারে শিলিগুড়ি ছোট ভাই হলেও বিত্তের চমকে বড় ভাই জলপাইগুড়ি শহরকে সে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে এতে কোনও দ্বিমতের যে সুযোগ নেই তা জলপাইগুড়িবাসীরাও স্বীকার করেন। তবে বিত্তের থেকে কুলের পরিচয় নিয়ে যদি প্রতিযোগিতা হয় তবে জলপাইগুড়ি কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে এগিয়ে থাকবে। কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির মধ্যে সেই মানসিক দ্বন্দ্বের ঘা-টাকে খুঁচিয়ে তোলা নয়। আধুনিক দ্রুত যান্ত্রিক সভ্যতার নগরায়ণের এক মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

বিত্তের শিলিগুড়ি।

জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুণ্ঠপুর পরগনার ছোট্ট একটা মৌজা থেকে আজকের মহানগরে পরিণত শিলিগুড়ি। কিন্তু 'এটা আমার শিলিগুড়ি' এই ভাবনার নিঃশ্বাসে মনের মধ্যে এক নিবিড় আত্মীয়তার স্পর্শ অনুভব করার সেই মানসিকতার শেকড় এখনও গভীরে প্রবেশ করতে পারে নি। এটাই এই শহরের বিত্তের মাঝেই দৈন্যতা। সে দিক থেকে 'আমার শহর জলপাইগুড়ি' এই ভাবনায় জলপাইগুড়ি শহরের উষ্ণতা সেখানকার মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে নিজের শহরের প্রতি এক গভীর আত্মীয়তা বোধ।

তাই প্রশ্ন একটা ওঠে এই শহরটা কার?

এই প্রশ্নের মধ্যে অতি প্রগতিশীলরা প্রাদেশিক বিভাজনের গন্ধ খুঁজে পেতে চাইবেন। অথচ প্রশ্নটা তা নয়। বিষয়টা একটা শহর তথা জনপদের আত্মপরিচয়ের, কারণ, জনপদ গড়ে ওঠে এক একটি গোষ্ঠী বা জাতি সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে। একে বলা যায় ভরকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস। তাকে কেন্দ্র করে যেমন বিভিন্ন জলধারা সমুদ্রে মিলিত হয়ে সেই সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিশে যায় তেমনই নগরায়ণের

গতিসূত্র অনুসারে নানা জনস্রোত সেখানে এসে মিলিত হলেও জনপদের পরিচয়টি কিন্তু সেই ভরকেন্দ্রকে নিয়ে গড়ে ওঠে। উদাহরণ জয়পুর তথা গোলাপি নগর বা ‘ পিঙ্ক সিটি’। এই নামের মধ্যে কিন্তু রাজস্থানী প্রাদেশিকতা খোঁজার কথা ভাবা হয় না।

শিলিগুড়ি জনপদের ‘ভরকেন্দ্র’ কোথায়? এই শহরের জনস্রোত এসেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। কিন্তু এই ভরকেন্দ্র না থাকায় এরা সেই কেন্দ্রে মিলিত না হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে অনিয়ন্ত্রিত জলধারার মতন। তাই যত্রতত্র খানা ডোবার মধ্যে গড়ে উঠেছে জনবসতি। কোনওটা পাঞ্জাবী পাড়া, কোনওটা নেপালি বস্তি, কোনওটা মাড়োয়ারি বা বিহারি মহল্লা। আর স্বাধীনতা নামক আশীর্বাদ বা অভিশাপের ফলস্বরূপ রিফিউজির টিকা কপালে এঁটে পূর্ব পাকিস্তান থেকে উৎখাত হওয়া নয়া ইহুদির প্রবল স্রোত বাঙালি উদ্বাস্তুর জলধারা।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনায় ‘ইন্ডিয়া ইজ মেকিং’— যখন গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তখনই সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই হয়ে গেল ‘স্বাধীন ইন্ডিয়া’। ভারত হল দ্বিখণ্ডিত। অসম্পূর্ণ বাড়িতেই যদি বিশাল পরিবারের গৃহপ্রবেশ ঘটে যায় তখন সেই বাড়িতে যেমন সৃষ্টি হয় নানা বিশৃঙ্খলা, তেমনই একটা শহর গড়ে ওঠার মুখেই যদি বিভিন্ন জনস্রোতের ধাক্কা আছড়ে পড়ে সেখানে প্রথমেই যে জিনিসটা সবচেয়ে বিপদে পড়ে সেটা সেই শহরের প্রতি মমতা বোধের। কারণ তখন শুধু অসুবিধাগুলিই প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। শিলিগুড়ি তাই এখানে এখনও ‘আমার শহর’ হয়ে উঠতে পারে নি। পারে নি উপস্থিত করতে শিলিগুড়ির সংস্কৃতি আসলে কী।

শিলিগুড়ি শহর তার কলেবর ও বিত্তে ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। হতে চলেছে নগর থেকে মহানগরে।

নগরের প্রশ্নে ভারতের জনগণনার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে এর ন্যূনতম পরিমাপ হল ৫০০০ জনসংখ্যা অথবা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৪০০ মানুষের বসবাসের ঘনত্ব। পশ্চিমবঙ্গের পৌর আইনে বলা হয়েছে কম করেও ২০০০০ মানুষের বসবাস এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৭৫০ জন মানুষ এবং সেই জনসংখ্যার অর্ধেক অকৃষিকার্য জীবিকার সঙ্গে জড়িত। সেই হিসাবে এই রাজ্যে তিন ধরনের নগর আছে। (১) বড় নগর— মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (২) মাঝারি মিউনিসিপ্যালিটির নগর (৩) গ্রাম থেকে রূপান্তরিত নগর যা নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি। এছাড়াও অবশ্য আছে শিল্প ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকা। এগুলি নন-মিউনিসিপ্যাল আরবান এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ১৯৯১-২০০১ দশকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নগরায়নের হার যেখানে ২৭.৭৮ শতাংশ সেখানে পশ্চিমবঙ্গে এই হার ২৮.০৩ শতাংশ। নগরায়ন মাপা হয় মোট জনসংখ্যায় শহরবাসীর সংখ্যার অনুপাত দিয়ে। নগরায়নের বৃদ্ধি তাই নির্ভর করে মোট জনসংখ্যা ও শহরবাসীর অনুপাতের তুলনামূলক বৃদ্ধির ওপর।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার নগর ও নগরায়ন কিন্তু এক নয়। সে বিষয়ে অবশ্য পৃথকভাবে আলোচনা করা দরকার এবং সেই আলোচনার ইচ্ছেও আছে। নগরায়নের প্রশ্নে নগরের আশপাশের এলাকার উন্নতির কথা ধরা হয়। সেখানে যদি নগরের সুবিধাগুলি দেওয়া যায় তবে সেখানকার মানুষের নগর অভিমুখী হওয়ার প্রয়োজন হয় না। আজকের শিলিগুড়ির জনবিস্ফোরণের উৎসভূমি খুঁজতে এই প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবেই এসে পড়বে। শিলিগুড়ি শহর বাড়ছে। কিন্তু কার বিনিময়ে? এই শহরের পাশ্ববর্তী এলাকাগুলিতে যদি

আজকের শিলিগুড়ির জনবিস্ফোরণের উৎসভূমি খুঁজতে এই প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবেই এসে পড়বে। শিলিগুড়ি শহর বাড়ছে। কিন্তু কার বিনিময়ে? এই শহরের পাশ্ববর্তী এলাকাগুলিতে যদি নগরায়ণের প্রসার ঘটান যেত তবে সেখানকার মানুষ শিলিগুড়িতে জীবিকার তাগিদে এমনভাবে দলে দলে ভিড় করত না। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সরকারিভাবে এই শহরে কোনও বস্তির কথা স্বীকার করা হয় নি। আজ সেই সরকারি সূত্রেই বলা হয়েছে এই শহরে গড়ে উঠেছে প্রায় ২০০ বস্তি।

নগরায়ণের প্রসার ঘটান যেত তবে সেখানকার মানুষ শিলিগুড়িতে জীবিকার তাগিদে এমনভাবে দলে দলে ভিড় করত না। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সরকারিভাবে এই শহরে কোনও বস্তির কথা স্বীকার করা হয় নি। আজ সেই সরকারি সূত্রেই বলা হয়েছে এই শহরে গড়ে উঠেছে প্রায় ২০০ বস্তি। আগত এই জনতা তো কোনও ফ্ল্যাট কেনার এমন কি বাড়ি ভাড়ার ক্ষমতা নিয়েও আসে না। এরা তৈরি করে বস্তি।

১৯৪৯ সালে ৮টি ওয়ার্ড নিয়ে হিলকার্ট রোডের এক ভাড়া বাড়িতে শুরু হয়েছিল শিলিগুড়ি শহরের পরিচালনা। সত্তর বছর পেরিয়ে আজ ৪৭টি ওয়ার্ডের এক বড় নগর। আয়তন ৪১.৯১ বর্গ মিটার। জনসংখ্যা ৭,০৫,৫৭৯।

শরীরের ওজন বৃদ্ধিই তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, বরং বলা যায় এই ওজন বৃদ্ধি অনেক ক্ষেত্রেই প্রাণঘাতী হয়। একটা জনপদের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই কথা প্রযোজ্য। বিশেষ করে শিলিগুড়ির মতন হঠাৎ গজিয়ে ওঠা শহরের জন্য তো এটা আরও বেশি করে ভাবার প্রয়োজন।

‘হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা’— এই বিশেষণটা কিন্তু ভেবেচিন্তেই বলা। যে সমস্ত বিশেষ কারণের জন্য একটা জনপদ গড়ে ওঠে তার কোনওটাই শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে উপস্থিত করা যায় না।

কলকাতা গড়ে ওঠার পেছনে ছিল ঔপনিবেশিক স্বার্থের তাগিদ। দিল্লি গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক কারণে, বেনারসের পেছনে আছে ধর্মীয় কারণ। গৌহাটির পেছনে ছিল রেল, শিল্পের জন্য গড়ে উঠেছিল দুর্গাপুর ইত্যাদি। শিলিগুড়ি গড়ে ওঠার পেছনে যে কারণগুলি তা ছিল হঠাৎই শৈল নগরী দার্জিলিং যাওয়ার হল্টিং স্টেশন শিলিগুড়িতে হঠাৎই এসে পড়েছিল দেশভাগের উদ্বাস্তুর জনস্রোত। বলা যেতে পারে এই উদ্বাস্তুর দমকা স্রোত তো রাজ্যের আরও অনেক জেলাতেই আছড়ে পড়েছিল। সত্যি কথা। শিলিগুড়ি তখনও ছিল এক রাস্তা হিলকার্ট রোড কেন্দ্রিক এক শহর। হিলকার্ট রোড ছাড়িয়ে হাকিমপাড়াতে একটাই কাঠের বাড়ি আর ঘরে ঘরে হ্যারিকেন লণ্ঠনের মিটমিটে আলো। পুজো বলতে শিলিগুড়ি জংশন (তখন শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনই ছিল একমাত্র স্টেশন তথা রেল জংশন) এর পাশে রেলের মুষ্টিমেয় বাঙালি কর্মচারী আয়োজিত দুর্গা পুজো।

১৯৬২ সালে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ঘটল চিনা বাহিনীর অপ্রত্যাশিত আক্রমণ। উত্তর-পূর্ব সীমা রক্ষায় প্রথম অনুভূত হল শিলিগুড়ির ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব। ভারত ভাগের পর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রাজ্যগুলির জন্য শিলিগুড়ির অবস্থান যে মোরগের সরু গলার মত সেই সামরিক উপলব্ধি শিলিগুড়িকে এনে দিল আজকের শিলিগুড়িতে রূপান্তরিত হবার সুযোগ। সামরিক ছাউনি ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে বিশাল ক্যান্টনমেন্ট একদিকে যেমন এখানে নানা ধরনের কাজের সুযোগ এনে দিল, পাশাপাশি শিলিগুড়িকে রূপান্তরিত করল বাণিজ্যিক কেন্দ্রে। যে হিলকার্ট রোড ছিল আগত উদ্বাস্তুদের ছোট ছোট দোকানে ঢাকা সেই হিলকার্ট রোড দার্জিলিং চা এবং তিব্বত সীমান্তে ইংরেজ সেনার প্রয়োজনে নির্মাণের পর আবার নতুন করে তার বিস্তারের প্রয়োজন হল। ঘুপচি দোকানের উচ্ছেদ ঘটিয়ে তাদের পুনর্বাসনের জন্য নির্মিত হল আজকের বিধান মার্কেট। হিলকার্ট রোডের জমির বাজার দর হয়ে গেল আকাশচুম্বী। স্থানীয় বাঙালি মালিকেরা সেই অর্থের হাতছানিকে উপেক্ষা করতে না পেরে কাঁচা টাকার ঈশারায় বিক্রি করতে শুরু করল আগত ভিন প্রদেশ থেকে আগত মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের। জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটতে শুরু হল দ্রুত গতিতে। জনবিস্ফোরণের হার হল অবিশ্বাস্য হারে। দেশের অন্য শহরের জনসংখ্যার হারকে ছাপিয়ে দাঁড়াল ১১৯.৫ শতাংশ।

এখানেই মূল নগরায়ণের সমস্যা বা অসুখ। এই জনসংখ্যার চাপ বইবার ক্ষমতাকে সহ্য করার জন্য যে পরিকল্পিত পরিকাঠামো গড়ার প্রয়োজন ছিল তা করার কথা ভাবা হয়নি। বরং এই বৃদ্ধিকে যেভাবে খুশি ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল।

আজকের শিলিগুড়ি তাই কার শিলিগুড়ি বোঝা যাচ্ছে না। ‘এই আমার শিলিগুড়ি’ সেই আবেগ এখনও জায়গা করে নিতে পারে নি এখানকার বাসিন্দাদের ওপর। সেটা যে একান্তই প্রয়োজন।

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

গান্ধীবাদ! নাকি গান্ধী বাদ?

জয়ন্ত গুহ

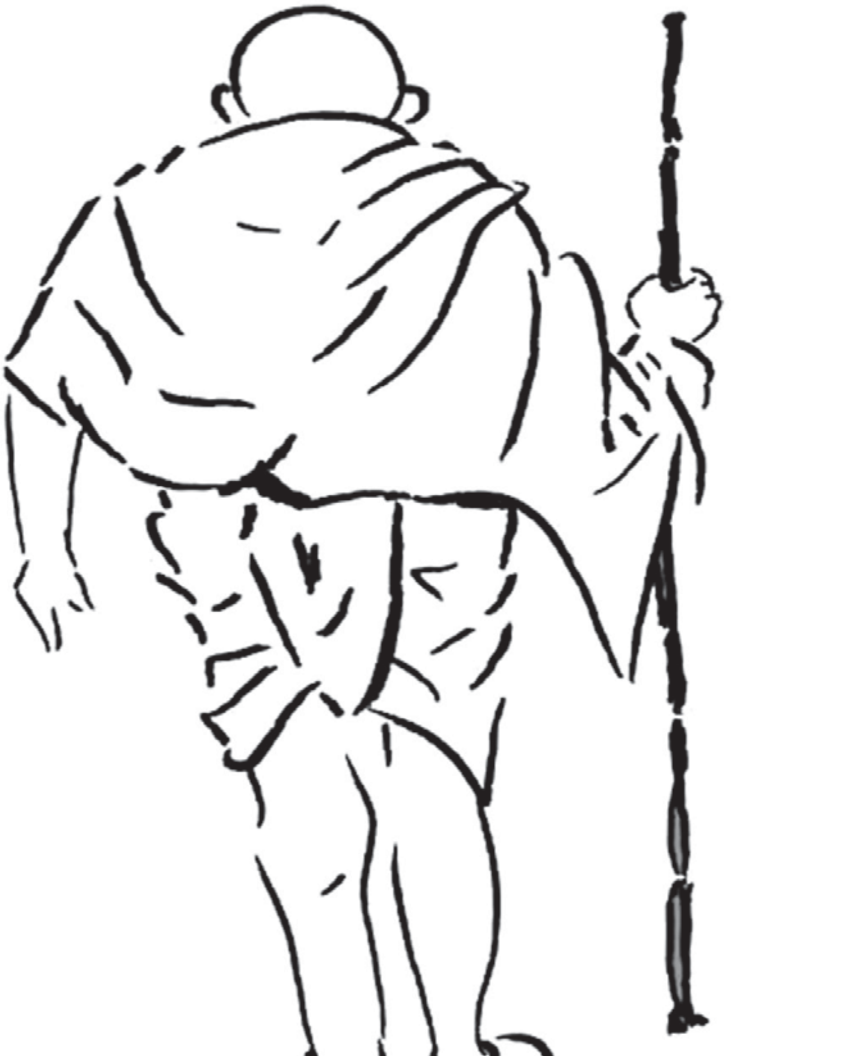

আসলে গান্ধীবাদ কী? কেন? কীভাবে আজকের দিনে কতটা প্রাসঙ্গিক বা নয় তা শুধু বই পড়ে মুখস্ত করলেই যথেষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ চন্দ্র বসু, তিলক, আম্বেদকর, নেহরু-জিন্না-বল্লভভাই বা অনুশীলন সমিতির সঙ্গে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মতবিরোধের তুলনামুলক বিশ্লেষণেও গান্ধীভাবনা বোঝা দুস্কর। আমি অন্তত পারি নি। বারেবারে গুলিয়ে গেছে। কংগ্রেস নেতাদের কাছে যৌবনে শুনেছি —গান্ধী একজন আদর্শবাদী নেতা ছিলেন, উনি আমাদের আদর্শ। অতি বামেরা বলত বুর্জোয়া। কম্যুনিস্টরা গম্ভীরমুখে বলতেন, গান্ধী নিঃসন্দেহে ‘গ্রেট লিডার বাট ইউটোপিয়ান’।

সালটা ১৯২৫। মে মাস। চরকার প্রচারে মহাত্মা গান্ধী বেরিয়েছেন দেশভ্রমণে। মাসখানেক হল তিনি এসে রয়েছেন বাংলায়। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতপার্থক্য সুবিদিত। কবি চরকায় আস্থা রাখতে পারেন নি। কথাটা তাঁর অজানা নয়। কিন্তু মতপার্থক্য থাকলে এড়িয়ে যাবেন এমন মানুষ গান্ধীজি নন। নিজেই চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মতবিরোধের একটা আশঙ্কা ছিলই কিন্তু গান্ধীজি নিজেই যখন দেখা করতে চাইছেন তখন সব আশঙ্কাকে দূরে সরিয়ে রবীন্দ্রনাথ পত্র পাঠালেন গান্ধীজিকে। অনুরোধ, তিনি যেন একবারটি শান্তিনিকেতনে আসেন। মহাত্মা গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে, ২৯ মে।

সে প্রসঙ্গে আসছি পরে কিন্তু প্রায় একই সময়ে ১৬ মে দার্জিলিং-এ বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। শান্তিনিকেতন পর্ব সেরে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে গান্ধীজি সোজা পৌঁছে যান দার্জিলিং-এ, অসুস্থ চিত্তরঞ্জনকে দেখতে। চৌরাস্তা মল থেকে ৫ মিনিটের হাঁটাপথে সিআর দাস রোড। একটু এগোলেই বাঁ হাতে একটি সুন্দর দুইতলা বাড়ি ‘স্টেপ অ্যাসাইড’- ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্যার নৃপেন্দ্র নাথ সরকারের এই বাড়িতেই এসে উঠেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস। গান্ধীজিকে নিয়ে সেদিনের স্মৃতির কথা বলতে গিয়ে, স্মৃতিকথনে ৮৪ বছর বয়সে বাসন্তীদেবী-তো হেসে কুটিপাটি। তিনি এবং চিত্তরঞ্জন, দুজনের কাছেই গান্ধীজি ছিলেন

বড়দাদার মত। হেনা চৌধুরীর লেখা "দেশবন্ধুর জীবন বেদ" বইয়ে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে গান্ধীজি এবং চিত্তরঞ্জনের কথোপকথন এবং আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সেদিনের সেইসব মুহূর্ত। মাত্র তিনবছর আগেই চৌরিচৌরা-র ঘটনার পর হিংসার প্রতিবাদ জানিয়ে গান্ধীজি যখন অসহযোগ আন্দোলন থেকে সরে আসেন তখন বিঠলভাই প্যাটেল এবং সুভাষ চন্দ্র বসু-র সঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাশও গান্ধীজির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। আবার সেই চিত্তরঞ্জনকে দেখতেই সশরীরে দার্জিলিং পৌঁছে গেলেন গান্ধীজি। সারাজীবনে মাত্র একবারই তিনি গিয়েছিলেন দার্জিলিং। যাইহোক গান্ধীজি যখন দার্জিলিং পৌঁছন চিত্তরঞ্জন তখন যথেষ্ট সুস্থ বোধ করছেন। ৪-৯ জুন, কংগ্রেস ও স্বরাজ পার্টি নিয়ে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সেরে গান্ধীজি রওনা দেন শিলিগুড়ির উদ্দেশে। দেখা করতে হবে কংগ্রেস নেতা শিউমঙ্গল সিং-এর সঙ্গে। উত্তরবঙ্গে কংগ্রেস তখন পরিচালিত হয় জলপাইগুড়ি থেকে এবং শিউমঙ্গল সিং তখন উত্তরবঙ্গের প্রভাবশালী নেতা।

দার্জিলিং থেকে সড়কপথে হিলকার্ট রোড ধরে গান্ধীজি শিলিগুড়ি আসেন, হাসমি চকের পাশে স্বাধীনতা সংগ্রামী শিউমঙ্গল সিং-এর কাঠের বাড়িতে। শিলিগুড়ির তিলক ময়দানে গান্ধীজি এক সভায় ভাষণও দেন। জলপাইগুড়িতেও জনসভায় বক্তব্য রাখেন তিনি। ইংরেজ হটাতে একসঙ্গে লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছিলেন কংগ্রেস কর্মীদের। কিন্তু শিলিগুড়িতে বা জলপাইগুড়িতে গান্ধীজিকে নিয়ে এসব স্মৃতির কোনও ছবি এখনও পাওয়া যায় নি। অথচ এই শিউমঙ্গলকে নিয়ে গান্ধীজির ব্যক্তিগত সচিব মহাদেব দেশাই তাঁর 'ডে টু ডে উইথ গান্ধীজি' বইতে লিখেছেন, 'ইন শিলিগুড়ি উই কেম অ্যাক্রস এনাদার সলিটারি ফ্রেন্ড ওয়ার্কিং আওয়ে উইথ দ্য সেম ক্যুইট ফেইথ এন্ড ডগড জীল... হি হ্যাড প্রিএরেঞ্জড টু লাভলি মিটিংস ফর গান্ধীজি। দ্য ফ্রেমওয়ার্ক অফ দ্য হাউস হি ওয়জ বিল্ডিং ওয়জ রেডি বাই দেন এন্ড হি হ্যাড ফিক্সড উডেন বোর্ডস ইন ইট ফর গান্ধীজিস হল্ট।'

উত্তরবঙ্গে তাঁর প্রভাব ছিল অপ্রতিরোধ্য। ১৯৪২ সালের ৯ আগস্ট গান্ধীজি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিলে দেশজুড়ে মানুষ নেমে পড়েছিল পথে। ব্যতিক্রম ছিল না তখনকার আপাতশান্ত শিলিগুড়িও। নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন দুই কংগ্রেস নেতা বীরেশ্বর মজুমদার ও ধীরেন্দ্রনাথ রায়। অন্য দুই নেতা শিউমঙ্গল সিং ও ব্রজেন্দ্রকুমার বসু রায়চৌধুরীকে পুলিশ আগেই গ্রেপ্তার করে। কয়েক হাজার মানুষ মিছিল করে ঘিরে ফেলেছিলেন শিলিগুড়ি থানা। সকলেরই হাতে লাঠি-সহ নানা দেশি অস্ত্র। নেতাদের একটা ইঙ্গিত পেলেই উত্তেজিত জনতা ঝাঁপিয়ে পড়বে থানার পুলিশকর্মীদের উপর। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর নীতি মেনে থানায় হামলা চালানোর পক্ষপাতী নন স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা। উত্তেজিত জনতাকে তাঁরা শান্ত করার চেষ্টা করছেন। তারই মধ্যে থানায় বাড়তি ফোর্স পৌঁছতেই পুলিশ ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালাল। সাত জন নিহত হলেন পুলিশের গুলিতে।

দেশের জন্য যে সাত জন প্রাণ দিলেন, তাঁদের নাম-ধাম, তাঁদের পরিবার নিয়ে কিছু কি জানেন উত্তরবঙ্গের কংগ্রেস নেতারা? ১৫ অগস্ট ২০১৯, কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভাপতি এবং বিধায়ক শঙ্কর মালাকার বলেছিলেন, "শহিদদের নামধাম আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে বলতে হবে।" শিলিগুড়িতে শিউমঙ্গল সিং-এর যে সামান্য সাধারণ কাঠের বাড়িতে রাত্রিবাস করেছিলেন গান্ধী সেখানে আজ দশতলা বহুতল। কোনও মিউজিয়াম তৈরির পরিকল্পনা ছিল বা আছে কি কংগ্রেস নেতাদের? জানা নেই এমন কোনও তথ্য। একসময়ে কংগ্রেসের শক্ত ঘাটি উত্তরবঙ্গের কংগ্রেস নেতারা, যারা 'ফিরোজ জাহাঙ্গীর ঘ্যানডি' এবং ইন্দিরা নেহরু পরিবারের খুব কাছের লোক তাঁরা কি তাঁদের রাজনৈতিক দর্শন থেকে 'গান্ধী' বাদ দিয়ে দিয়েছেন? নাকি ঈশোপনিষদ অনুপ্রাণিত 'গান্ধীবাদ' তাঁদের এখনও ভাবায়?

১৯৪৭-এ দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন রাজনৈতিকভাবে গান্ধী-নেহরু এক মেরুতে থাকলেও, অর্থনৈতিক ভাবনায় দুজনের মধ্যে ছিল বিভাজন। গান্ধীজির অর্থনৈতিক মডেল ছিল স্বদেশী ও আত্মনির্ভরতা। কারখানা নয়, ঘরে ঘরে তৈরি হবে মানুষের বেঁচে থাকার প্রাথমিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী, স্বনির্ভর গ্রাম, এবং প্রত্যেক ঘরে ঘরে থাকবে চরকা। তাঁর সোজাসাপটা যুক্তি ছিল, কেন আমার দেশ ম্যাঞ্চেস্টারে সুতো রপ্তানি করে সেই সুতোতেই তৈরি বহুমুল্য পোশাক আমদানি করবে? বরং দেশেই তৈরি হবে দেশের মানুষের জামাকাপড়। এক্ষেত্রে নেতাজি ও নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মৌলিক মতবিরোধ ছিল গান্ধীর।

আসলে গান্ধীবাদ কী? কেন? কীভাবে আজকের দিনে কতটা প্রাসঙ্গিক বা নয় তা শুধু বই পড়ে মুখস্ত করলেই যথেষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ চন্দ্র বসু, তিলক, আম্বেদকর, নেহরু-জিন্না-বল্লভভাই বা অনুশীলন সমিতির সঙ্গে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মতবিরোধের তুলনামুলক বিশ্লেষণেও গান্ধীভাবনা বোঝা দুস্কর। আমি অন্তত পারি নি। বারেবারে গুলিয়ে গেছে। কংগ্রেস নেতাদের কাছে যৌবনে শুনেছি — গান্ধী একজন আদর্শবাদী নেতা ছিলেন, উনি আমাদের আদর্শ। অতি বামেরা বলত বুর্জোয়া। কম্যুনিস্টরা গম্ভীরমুখে বলতেন, গান্ধী নিঃসন্দেহে 'গ্রেট লিডার বাট ইউটোপিয়ান'। গান্ধী নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রথম শুনেছিলাম, ও আর টামবো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে যখন চেক আউট করছি জোহানেসবার্গের উদ্দেশে। এক বিশালদেহী কালো মানুষ এগিয়ে এসে বললেন —'ফ্রম গান্ধীস কান্ট্রি?' আমি তো অবাক! দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আড্ডা-আলোচনার সময় দেখেছি গান্ধী নিয়ে তাঁদের কী বিপুল উৎসাহ। কিন্তু কেন? সহজ তিনটি উত্তর এসেছিল তাঁদের পক্ষ থেকে। প্রথমত সহনশীলতা এবং আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সূত্র খোঁজা। দ্বিতীয়ত আধ্যাত্মিকতা এবং জাতীয়তাবাদের এক অভিনব মিশেল। তৃতীয়ত গ্রামীণ মাইক্রো ইন্ডাস্ট্রিস (আসলে কুটিরশিল্প বলতে চাইছিল)-এর মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন। আমার অবাক হবার আরও বাকি ছিল যখন শুনলাম তাঁদের অনেকেরই গবেষণার বিষয় গান্ধী! এদের মধ্যে একজন ছিলেন জার্মান। গান্ধীর আধ্যাত্মবাদ তাঁকে কিভাবে আকৃষ্ট করল? হাসতে হাসতে তিনি উত্তর দিলেন- কেন ইয়েলিনা পেত্রভিনা ব্লাভাতস্কায়া, যিনি দীর্ঘদিন ছিলেন ভারতবর্ষে। আর্য সমাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল লন্ডনে। ১৮৮৯ সালে।

একথা ঠিক যে গান্ধী এবং নেহরু দুজনের সঙ্গেই আত্মিক সম্পর্ক ছিল রাশিয়ান অকাল্টিস্ট (অতিপ্রাকৃত) ব্লাভাতস্কায়ার প্রতিষ্ঠিত (১৮৭৫ নিউইয়র্ক) 'থিওসফিক্যাল' সোসাইটির, ভারতবর্ষ থেকে অনুপ্রাণিত এই সোসাইটি ছিল পাশ্চাত্যের অন্যতম প্রথম ও প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক সংগঠন। যাদের চর্চার বিষয় এসোটেরিক রিলিজিয়ন হলেও তাঁরা ছিলেন ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরোধী এবং জাতীয়তাবাদী। 'থিওসফিক্যাল' সোসাইটির দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ ছিল 'মানবতার আধ্যাত্মিক ভূমি'। তাঁদের ভাবনায় প্রতিধ্বনিত হত হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্ম, কুণ্ডলিনী, চক্র, কর্মবাদ এবং পুনর্জন্ম। ১৮৯৩-র পর স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য সফরে, সোসাইটির সদস্যরা বারবার দেখা করেছেন স্বামীজির সঙ্গে। কেউ কেউ বলেন, গান্ধীজি এই সংগঠনের সদস্য ছিলেন। সে দাবী গান্ধীজি নস্যাৎ করে দিলেও কখনো আড়াল করেননি 'থিওসফিক্যাল' সোসাইটি, সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ব্লাভাতস্কায়া এবং একদা আইরিশ মার্কসিস্ট, পরবর্তীকালে 'থিওসফিক্যাল' সোসাইটি এবং স্বামী বিবেকানন্দ অনুপ্রাণিত অ্যানি বেসান্তের প্রতি তাঁর সহানুভূতির কথা। পেত্রভিনা ব্লাভাতস্কায়া কি রাশিয়ান-জার্মান ডবল এজেন্ট ছিলেন? ব্লাভাতস্কায়ার "গ্রেট হোয়াইট ব্রাদারহুড অফ মহাত্মাস ইন টিবেট" থিয়োরি কতখানি প্রভাবিত করেছিল হেনরিক হিমলার-কে (যার মাধ্যমে সুভাষ বসু দেখা করেছিলেন হিটলারের সঙ্গে)? এসব ইতিহাসের এক জটিল অধ্যায়। সেসব আজ থাক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার তিন বছর আগে ১৯১৫ সালের ৯ জানুয়ারি গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে আসেন দেশে। 'থিওসফিক্যাল' সোসাইটির অ্যানি বেসান্ত তখন ভারতে। চিকাগোর ধর্মসভায় বিবেকানন্দের বক্তৃতায় অভিভূত হয়ে তিনি ভারতবর্ষে আসেন ১৮৯৩-র ডিসেম্বর। ১৯১৪ সালে চেন্নাইতে কংগ্রেসের ২৯তম সেশনে অংশগ্রহণ করেন সিস্টার নিবেদিতার স্নেহের পাত্রী অ্যানি বেসান্ত। এরপর আইরিশ হোমরুল আন্দোলনের আদলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, সঙ্গে পেয়েছিলেন লোকমান্য তিলক, চিত্তরঞ্জন দাস ও মতিলাল নেহরুকে। ১৯১৭-তে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেফতার করে অ্যানি বেসান্তকে। তাঁকে জেলমুক্ত করার পিটিশন করেছিলেন আইনজীবী এম কে গান্ধী। জেল থেকে বেরিয়ে সে বছরেই ডিসেম্বরে কংগ্রেসের কলকাতা সেশনে, কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন অ্যানি বেসান্ত। কিন্তু এরপরেই উত্থান

ভারতবর্ষের প্রবাদপ্রতিম জননেতা মহাত্মা গান্ধীর। 'ড্রয়িংরুম এলিট'স ডিসকাশন' থেকে এই প্রথম, গান্ধীজির হাত ধরে কংগ্রেস ছড়িয়ে পড়ল গোটা দেশজুড়ে, সাধারণ মানুষের মধ্যে। অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় অ্যানি বেসান্তের, যদিও সম্পর্ক নষ্ট হয় নি।

ঠিক যেমনটা, মতবিরোধ থাকলেও গান্ধীজির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক কখনও শেষ হয়ে যায় নি। বিভিন্ন মতামতকে তিনি বরাবর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং বিরোধী মতামত তিনি কখনই এড়িয়ে যান নি। অসহযোগ আন্দোলনের একটা পর্যায়ে (চৌরিচৌরা) মহাত্মা গান্ধীকে লেখা খোলা চিঠিতে অহিংস আন্দোলন সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন কবি। তাঁর লেখনী থেকে উঠে এসেছিল, "আপনার শিক্ষা বিধাতার সাহায্য নিয়ে অহিংসার পথে লড়াইয়ের শিক্ষা। কিন্তু, এমন লড়াই শুধু নায়কদের জন্য সম্ভবপর, সাধারণের জন্য নয়। সাধারণ মানুষ মুহূর্তের উন্মাদনায় উদ্দীপ্ত হয় বারবার। তাই, অন্যায়ভাবে সে উদ্যম প্রতিহত হলে অপমানজনক সন্ত্রাস আর হিংসা সহজেই সেই লড়াইয়ের পথ হয়ে উঠতে পারে।" গান্ধীজির 'চরকা নীতি' নিয়েও রবীন্দ্রনাথের জোরালো বিরোধিতা ছিল। ১৯২৫ সালের একটি প্রবন্ধে স্বদেশী আন্দোলনকে 'চরকা সংস্কৃতি' বলে বিদ্রুপ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কঠোর সমালোচনা করেন। কিন্তু গান্ধীজি সেই মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং শান্তিনিকেতনে নিজে দিয়ে দেখা করছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। ২৯ মে ১৯২৫। সেবার দুজনের আলোচনার বিষয় ছিল 'চরকা'। বারেবারে তিনি গিয়েছেন শান্তিনিকেতনে। এমনকি দেশের জন্য দেশীয় কায়দায় শিক্ষানীতি তৈরি করতে, পরামর্শ ও সাহায্য নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের।

গান্ধীজি দীর্ঘসময় ধরে নানা পরীক্ষানিরীক্ষার পর তাঁর শিক্ষাচিন্তা ভারতবাসীর সামনে উপস্থিত করেছিলেন। জাকির হোসেনকে নিয়ে কমিটি তৈরি করেছিলেন। আর্যনায়কম দম্পতির মতো মানুষদের শান্তিনিকেতন থেকে নিয়ে গেছেন নতুন শিক্ষানীতি তৈরি করতে। মানভূমে 'মাঝিহিরা' গ্রামে চিত্তভূষণ দাশগুপ্তের নেতৃত্বে গান্ধীজির নয়া শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করে সংগঠন গড়ে উঠেছিল ১৯৪০ সালে। নানা মতের মঞ্চ কংগ্রেস ১৯৩৮ সালেই সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে স্থির করেছিল ভারতবাসীকে শিক্ষায় সচেতন ও স্বয়ম্ভর করতে গান্ধীজির শিক্ষানীতিকেই প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর যে শিক্ষাব্যবস্থা দেশজুড়ে কার্যকরী হল, তাতে গান্ধীজির নয়া শিক্ষাপদ্ধতি (বুনিয়াদি শিক্ষা) ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল। ভারী শিল্পনীতির সঙ্গে আঁকড়ে ধরা হল পাশ্চাত্যের শিক্ষানীতিকেই। কোঠারি কমিশন ওয়ার্ক এডুকেশনের নামে সাধারণ প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে শেষ করে দিয়েছিল বুনিয়াদি শিক্ষার সম্ভাবনাকে। স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে কার্যত পরিত্যক্ত হয় গান্ধীজির শিক্ষা ভাবনা। পশ্চিমবঙ্গে এই কাজটি দ্রুত সম্পন্ন হয়।

গান্ধীজির বুনিয়াদি শিক্ষা ছিল সকলের জন্য। সব শিশুর জন্য। হিন্দুস্তানি তালিম সংঘ গান্ধীজির শিক্ষানীতিকে ভিত্তি করে যে পাঠক্রম তৈরি করেছিল, তা হল—

১. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, এর থেকেই আসবে পরিবেশকে পরিষ্কার রাখা।
২. গ্রামীণ শিল্পের বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান ও সেই জ্ঞানের সাহায্যে আরও উন্নতি।
৩. শিক্ষকের ভূমিকা শিশুকে শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ করে দেওয়া নয়, তার সামর্থ্য ও ক্ষমতাকে আবিষ্কার করে তাকে উপযুক্ত কাজে প্রেরণা ও দায়িত্ব দেওয়া। এইভাবে গণতান্ত্রিক উদ্যোগকে উৎসাহিত করা।
৪. ছেলে ও মেয়েকে সমান স্থান দেওয়া।
৫. প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ যত্ন নেওয়া।
৬. দেশ পরিচালনার দক্ষতা ও ক্ষমতাগুলি বাড়ানোর জন্য বিশেষ তালিম দেওয়া। যেমন ভোটিং, ডিবেট প্রভৃতিতে অংশ নেওয়ানো।

গান্ধীজির ভাবনায় শিক্ষা বা জ্ঞান নির্ভর করে

১৯৪৫-এর আগস্ট মাসে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হন সুভাষ বসু এবং সে বছরই ৫ অক্টোবর, নেহরুকে লেখা চিঠি ('দ্য ভিলেজ অফ মাই ড্রিমস')-তে গান্ধী, তাঁর স্বদেশী এবং গ্রামীণ বিকাশের ভাবনা উপেক্ষিত হচ্ছে বলে সরাসরি অভিযোগের আঙুল তোলেন তাঁর অনুগামী নেহরুর বিরুদ্ধে। উত্তরে নেহরু বলেছিলেন, "সাধারণত আমরা জানি একটি গ্রাম বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক ভাবে পিছিয়ে থাকে এবং পিছিয়ে থাকা একটা পরিবেশ থেকে কোনভাবেই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়"। নেহরুর কথায় মহাত্মার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল "সর্বৈব অবাস্তব"।

নির্দিষ্ট স্থান, কাল ও পরিবেশের ওপর। বিজ্ঞান যা বিশেষ জ্ঞান, তাই যদি 'সত্য' হয়, টেকনোলজি বা প্রযুক্তি তৈরি করে সত্যাগ্রহী। তিনি শিল্পবিপ্লবের বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু একেবারেই টেকনোলজি বিরোধী ছিলেন এমন ধারণা একেবারেই কল্পকথা। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'সত্যাগ্রহী প্রযুক্তি'-র ব্যবহার তার সমস্যাকে চিহ্নিত করতে পারে এবং সমস্যার সমাধানও করে ফেলে এবং গ্রামে গ্রামে সেই সত্যাগ্রহী তৈরি করবে বুনিয়াদি শিক্ষা।

বুনিয়াদি শিক্ষার পাঠক্রম কর্মকেন্দ্রিক এবং ক্র্যাফট নির্ভর। পাঠক্রমের কেন্দ্রে থাকতে পারে বয়ন বা কৃষি; থাকতে পারে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ অথবা অতি আধুনিক কোনও শিল্প যা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সহজ ও সুলভ। পাঠক্রম সেই শিল্পকে ঘিরে শিশুশিক্ষায় নানা বিষয়কে আনবে।

ধরা যাক, চরকা কেন্দ্রিক বয়নশিল্পের কথা। এই বয়ন থেকে অনেক বিষয় আসবে। যেমন - বয়ন শিল্প, জমি/মাটি, বৃক্ষরোপণ/বৃক্ষের বৃদ্ধির পর্যায়, ফল তুলো আহরণ পদ্ধতি, সংরক্ষণ পদ্ধতি, নানা প্রকারের তুলো, তুলো থেকে সুতো, সুতো কাটার যন্ত্র, কুটির শিল্প/বৃহৎ শিল্প, সুতো রঙ করা, নানা ধরনের তাঁত, কাপড় তৈরি নক্সা, রক্ষণ, বিক্রয় প্রভৃতি।

বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে হাতে কলমে কাজ হবে আবার উৎপাদনও হবে। কিন্তু বুনিয়াদি বিদ্যালয়টি কখনই কারখানা হয়ে উঠবে না। উৎপন্ন সামগ্রী থেকে বিদ্যালয়ের খরচের কিছু অংশ আসতে পারে। কিন্তু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতনের দায় সমাজকে, সরকারকে নিতে হবে। শিক্ষা দেওয়ার দায় সরকারের। পশ্চিমি সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের বদলে এভাবেই গ্রামনির্ভর অর্থনীতি ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন গান্ধীজি। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথও একইভাবে চিন্তা করেছিলেন। 'বহু সম্বন্ধ বিশিষ্ট সমাজের ভাবনা' ছিল রবীন্দ্রনাথের। সংক্ষেপে এটাই ছিল গান্ধীজির দেশীয় কায়দায় শিক্ষা ও উন্নয়ন ভাবনা। যদিও অমর্ত্য সেন মহাশয়, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করে গান্ধীর শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে এমনটা নিশ্চয়ই হত না। আসলে তুলনা করে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের নাগাল পাওয়া বড় কঠিন। দুজনেই স্বাধীনতা চাইছেন। সমালোচনা করছেন কখনও রবীন্দ্রনাথ। আবার সেই তিনিই অনশনক্লিষ্ট গান্ধিজির সামনে বসে আকুল হয়ে গাইছেন 'জীবন যখন শুকায়ে যায়...করুণাধারায় এসো'। কী করে এমন এক চরিত্র— 'গান্ধী'-কে স্বাধীনতা উত্তর স্বদেশে বাদ দেব বলুন তো!

'মহাত্মা বলতেন, গ্রামে চলো । যতদিন না গ্রামের উন্নয়ন হবে ততদিন দেশের বিকাশ হবে না । স্বাধীনতার পর আমরা ভুল পথ বেছে নিয়েছি। গ্রামের পরিবর্তে শহরের উপরে নজর দিয়েছি।' ২০১৯-ও দাঁড়িয়ে প্রবীণ গান্ধীবাদী নেতা আন্না হাজারের অভিযোগ। সত্যি ইতিহাস কী চূড়ান্ত নির্মম। ১৯২৯-এ লাহোর কংগ্রেসে চল্লিশ বছরের জওহরকে সভাপতি মনোনীত করে গান্ধীজি ওয়ার্কিং কমিটি থেকে সুভাষকে বাদ দিয়েছিলেন। আর সেই গান্ধীই ক্রমশ বাদ হয়ে গেলেন গান্ধীজির-ই মনোনীত, স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর আমলে। কিন্তু কেন? দেশের স্বাধীনতা প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং মুখ্য অর্থনৈতিক ইস্যু দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই হলে গান্ধীজির তো উপেক্ষিত হবার কথা নয়। ১৯৪৭-এ দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন রাজনৈতিকভাবে গান্ধী-নেহরু এক মেরুতে থাকলেও, অর্থনৈতিক ভাবনায় দুজনের মধ্যে ছিল বিভাজন। গান্ধীজির অর্থনৈতিক মডেল ছিল স্বদেশী ও আত্মনির্ভরতা। কারখানা নয়, ঘরে ঘরে তৈরি হবে মানুষের বেঁচে থাকার প্রাথমিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী, স্বনির্ভর গ্রাম, এবং প্রত্যেক ঘরে ঘরে থাকবে চরকা। তাঁর সোজাসাপটা যুক্তি ছিল, কেন আমার দেশ ম্যাঞ্চেস্টারে সুতো রপ্তানি করে সেই সুতোতেই তৈরি বহুমুল্য পোশাক আমদানি করবে? বরং দেশেই তৈরি হবে দেশের মানুষের জামাকাপড়। এক্ষেত্রে নেতাজি ও নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মৌলিক মতবিরোধ ছিল গান্ধীর। ১৯৩৮-এ হরিপুরায় ৫১তম কংগ্রেস সেশনে, সভাপতির ভাষণে নেতাজি, আগামীদিনের স্বাধীন ভারতে শিল্পায়নের জন্য প্রথম প্ল্যানিং কমিশনের ধারণা দিচ্ছেন। আধুনিকতার সঙ্গে তাল রেখে দ্রুত

শিল্পবিকাশের জন্য নেহরুকে চেয়ারম্যান করে সুভাষ একটি প্ল্যানিং কমিটিও তৈরি করেছিলেন, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহযোগিতায় স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের শিল্প পুনর্গঠন। বলতে ভোলেন নি জমিদারি প্রথা বিলোপ এবং ধীরে ধীরে গোটা দেশের কৃষি এবং শিল্প ব্যবস্থাকে নিয়ে আসতে হবে উৎপাদন এবং বন্টনের প্রক্রিয়ায়। ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের এই ভাবনার সঙ্গে কখনই একমত ছিলেন না গান্ধী। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এবং ইস্পাত কারখানা ছিল গান্ধীজি অনুগামী নেহরুর স্বনির্ভরতার মূলমন্ত্র। "মানুষের অসহনীয় দারিদ্র্যমুক্তি"-র জন্য তিনি প্রযুক্তি, মেশিন এবং শিল্পায়ন নিয়ে এগিয়ে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি পরিস্কার বলছেন, আই অ্যাম অল ফর ট্র্যাক্টরস অ্যান্ড বিগ মেশিনারি"। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে কোন পথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে সে নিয়ে সুভাষ চন্দ্র বসু এবং নেহরু দুজনেই সোভিয়েত রাশিয়ার ব্যাপক ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের একশভাগ সমর্থক ছিলেন। সুভাষ গ্রেট ব্রিটেনের "ধীরে ধীরে উন্নয়ন"-এর বদলে চেয়েছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ার মত ('ফোর্সড মার্চ') স্বল্প সময়ে ব্যাপক শিল্পায়নের মাধ্যমে তৎকালীন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

১৯৪৫-এর আগস্ট মাসে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হন সুভাষ বসু এবং সে বছরই ৫ অক্টোবর, নেহরুকে লেখা চিঠি ('দ্য ভিলেজ অফ মাই ড্রিমস')-তে গান্ধী, তাঁর স্বদেশী এবং গ্রামীণ বিকাশের ভাবনা উপেক্ষিত হচ্ছে বলে সরাসরি অভিযোগের আঙ্গুল তোলেন তাঁর অনুগামী নেহরুর বিরুদ্ধে। উত্তরে নেহরু বলেছিলেন, "সাধারণত আমরা জানি একটি গ্রাম বৌদ্ধিক এবং সাংস্কৃতিক ভাবে পিছিয়ে থাকে এবং পিছিয়ে থাকা একটা পরিবেশ থেকে কোনভাবেই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়"। নেহরুর কথায় মহাত্মার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল "সর্বৈব অবাস্তব"। কিন্তু এত কিছুর পরও, দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে, বল্লভভাই প্যাটেল নয়, নেহরুকেই 'সিলেক্ট' করছেন গান্ধীজি। যদিও স্বাধীন ভারতে কম্যুনিস্টদের উদ্দেশে তিনি বলছেন, "রাশিয়াকে তোমরা আধ্যাত্মিক 'হোম' হিসাবে শ্রদ্ধা কর, এটা আমার কাছে দুঃখজনক। ভারতীয় সংস্কৃতিকে নস্যাৎ করে তোমরা এখানে আনতে চাইছো রাশিয়ান সিস্টেম"।

এত বাগবিতণ্ডা, বিতর্ক, মতবিরোধ সত্ত্বেও, জন্মের ১৫০ বছর পরও তিনি আমাদের মন থেকে হারিয়ে যান নি। আজকের পৃথিবীতে তাঁর আত্মিক শক্তিকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কারুরই নেই। ইকলজি নষ্ট হয়ে গেলে আমরা কেউই বাঁচবো না- একথা মানুষ যত বেশি করে বুঝতে পারছে ততই বিশ্বজুড়ে আরও প্রাসঙ্গিক হচ্ছে গান্ধীবাদ। ১৯৩০-এ 'টাইম' ম্যাগাজিন-এর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গান্ধীজি বুঝতে পেরেছিলেন, সামান্যের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে অসীম ক্ষমতা। গ্রামনির্ভর ছোট শিল্পকে উপেক্ষা করে 'কারখানা' নির্ভর উন্নয়নই শেষ কথা নয়। কেননা একবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ 'কার্বন এমিসন' কীভাবে নিয়ন্ত্রন করা যায়। ইকলজির ক্ষতি না করে, আজকের ভারতবর্ষে বড় শিল্পের পাশাপাশি ছোট ছোট প্রয়াস, সামান্য ভাবনা এবং অভ্যাস পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েও আসতে পারে বড় পরিবর্তন। সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে দিয়েও যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন আসতে পারে তাঁর সোজাসুজি রেফারেন্স গান্ধীজি দিয়েছেন, এখন প্রশ্ন হল কীভাবে তাঁর প্রয়োগ হবে। ধরা যাক 'চরকা'। আজকের দিনে বাতিল বলে আপনি উপেক্ষা করতে পারেন। আবার 'চরকা' প্রতীকে গান্ধীজি আসলে যা বলতে চেয়েছিলেন সেই খাদি শিল্পকে, জাতীয়তাবাদী ভাবনার সঙ্গে জুড়তেই হাতেনাতে ফল পেয়েছি আমরা। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর খাদি নিয়ে জোরালো প্রচার করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মাত্র ৪ বছরে ২০১৮-য়, মৃতপ্রায় খাদি ও গ্রামীণ শিল্পের বিক্রি বেড়ে হয় ৬.৭ শতাংশ থেকে ৩৩ শতাংশ। গান্ধীজিকে নিয়ে কংগ্রেসের শ্রদ্ধার অভাব আছে এমনটা নয়। কিন্তু গান্ধী ভাবনায় অনুপ্রাণিত নরেন্দ্র মোদি সরকারের দু-দুটি প্রধান সরকারি কার্যক্রম - 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' এবং 'জনধন যোজনা'-র গুরুত্ব অস্বীকার করা যাবে না। দুটি যোজনাই আন্তর্জাতিকভাবে বহু আলোচিত। কিন্তু কেন? প্রথমত গান্ধীভাবনার 'সামান্যদর্শনের' জোর। দ্বিতীয়ত আমাদেরই তৈরি 'সভ্যতার সঙ্কট' হয়ত প্রাসঙ্গিক করে তুলছে গান্ধীবাদকে। তৃতীয়ত ভারতবর্ষের সঙ্গে গোটা পৃথিবী হয়ত দেখতে চায়, দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী মডেলে গান্ধীবাদ কী রূপ নেয়?

সাধারণত আমরা এদিন দেখেছি, দেশে এবুং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোশ্যালিস্ট এবং ডেমোক্র্যাটসরা গান্ধী মডেল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। এখন পৃথিবীজুড়ে দক্ষিণপন্থার দাপট। তাঁরা এখন প্রয়োগ করবে গান্ধী মডেল। রাজনীতি বা সময়ের প্রয়োজনে, দক্ষিণপন্থা গান্ধীর আরও কাছাকাছি আসবে। গান্ধীবাদ নিয়ে জয়স্তুতিও হতে পারে রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায়ঃ

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে. মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।

তব ভুবনে তব ভবনে. মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান

দক্ষিণবাদে গান্ধী কি নতুন দিশা পাবেন? নাকি মুখ থুবড়ে পড়বে? সেকথা বলার সময় এখনও আসে নি। সময়ই বলে দেবে 'গান্ধী' বাদ? নাকি গান্ধীবাদের জয়? আপাতত ২০১৯-এ গান্ধীর জন্মদিনে পদযাত্রায় নামছে কংগ্রেস-বিজেপি উভয় শিবির। আম্বেদকরপন্থী দলিত রাজনীতি এখনও গান্ধীজিকে নিয়ে চ্যালেঞ্জের লাইন থেকে সরে আসে নি। কম্যুনিস্ট 'সীতারাম'-রা, জন আন্দোলনে অহিংসার প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুললেও, গান্ধীবাদ থেকে সবার শেখার আছে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

নিঃসন্দেহে জন্মের ১৫০ বছর পর, তাঁকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মতামত ও ভাবনা আবার একত্রিত। চূড়ান্ত বিরোধিতা এবং সমালোচনাও আছে। প্রত্যাখানও আছে। আর এই সব কিছুকে নিয়েই গান্ধী জননায়ক হয়েছিলেন। হয়ত আগামীদিনে দক্ষিণপন্থার সর্বাগ্রে থাকবেন গান্ধীজি! মনে হতে পারে অবিশ্বাস্য কিন্তু 'গান্ধী' যদি একটি ভাবনা হয়, তাহলে সেই ভাবনা ভীষণভাবে আনপ্রেডিকটেবল এবং ইনঅ্যাকিউরেট, আর সেখানেই হয়ত তার জোর। সেকারনেই হয়ত বাদ বা বাতিল হয়ে যেতে পারে। আবার পেতে পারে নতুন দিশাও।

এখন ডুয়ার্স-এ বিজ্ঞাপন দিন

General Rates for Display Ads (INR)

Full Page, Colour:15,000
Full Page, B/W: 9,000
Half Page, Colour: 8,000
Half Page, B/W: 6,000
Back Cover: 30,000
Front Inside Cover: 20,000
Back Inside Cover: 20,000
Double Spread: 30,000

Special Rates for Local Trade only

Strip Ad, Colour: 6,000
Strip Ad, B/W: 4,000
1/4 Page Ad, Colour: 2,500
1/4 Page Ad, B/W: 1,500
1/6 Page, Colour: 1,500
1/6 Page, B/W: 1,000

Mechanical Details: Full Page

Bleed {21cm (W) X 28 cm (H)}, Non Bleed {18cm (W) X 25 cm (H)}, Half Page Horizontal {18 cm (W) X 12 cm (H)}, Vertical {8.5 cm (W) X 25 cm (H)}, Strip Ad Vertical {5.6 cm (W) X 25 cm (H)}, Horizontal 18 cm (W) X 6.5 cm (H), 1/4 Page 8.5 cm (W) X 12 cm (H), 1/6 Page {5.75 cm (W) X 12.2 cm (H)}

Rates are effective from April 1, 2018 issue

বিজ্ঞাপন দিতে বা বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

কলকাতা ৯৯০৩৮৩২১২৩

উত্তরবঙ্গ ৯৪৩৪৪৪২৮৬৬

এখন ডুয়ার্স

চা বলয়ের লোককথা

উত্তরের উপকথা

জষ্টিমাসের বিকেল এত মোলায়েম হয় জানা ছিল না। ঢলে আসা রোদে নানান শেডের সবুজ রং মাখামাখি শুনশান জায়গাটা যেন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। এখানে ওখানে খুবলে যাওয়া চা-গাছের কার্পেট ছড়াতে ছড়াতে শেষ হয়েছে দূর পাহাড়ের গোড়ালিতে। সন্ধে নামলে শোনা যেতে পারে ঢোলমাদলের বোলতাল অথবা হাড়িয়াখোর মাতালের বিচিত্র ভাষার খিস্তিখাস্তা। একশো'রও বেশি ভাষা উপভাষা ঝোরা আর রোগা নদীর জল বেয়ে কখনও পায়চারি করছে সমতলে, কখনও দৌড়াচ্ছে পাহাড়ের খিড়কি দরজায়। খুঁজতে জানলে সেখানেও কত কত লোককাহিনি মিলবে, সন্ধানী মাত্রই জানেন।

যিনি আতিথ্য করলেন, জাতিতে মুন্ডা। দোমড়ানো অশীতি শরীর অথচ চোখমুখে এমন প্রত্যয়, যেন গলা উঁচিয়ে জাহির করছে তিনি খাঁটি ভূমিসন্তান। বীরসা মুন্ডাকে বললেন দেবতা, অথচ স্বীকার করলেন উনগুলান বা বিদ্রোহ বিক্ষোভ ছেলেপুলেকে চাগিয়ে তুললেও আদিবাসি বুড়োবুড়ি একটা কথা সার বুঝে গেছে, যতই ডাইনি সন্দেহে নিরীহ কামিনদের লাঞ্ছনা হোক, যতই চা-বাগানের মালিক তাদের মরবার জন্য ছেড়ে রেখে পালাক, নেতারা যতই খয়রাত-ভিক্ষে বিলি করুক, এই ভিটেমাটি ছাড়া তাদের আর কোনও দেশ নেই, অকারণ লাফালাফি করে দেশছাড়া হবার মতন বোকামিও আর নেই।

বড়সড় সমাজ বিপ্লবের স্বপ্ন ছিল না, ছিল না বিখ্যাত হবার তাগিদ, তাই কি এঁদের কল্পনার উড়ানও ছোট্ট? তাই কি কল্পগল্পগুলিও নেহাত সাধারণ? গবেষকরা চুষে নিয়ে গেছেন প্রায় সবই, তবু শান্ত বনগন্ধমাখা ছোট্ট একটি গল্প ভালবেসেই আমার হাতে তুলে দিলেন বদান্য মানুষটি।

আদরের মোটা বিস্কুট আর লাল চায়ের সবটুকু চেটেপুটে খেয়ে গল্পে মন দিয়েছিলাম। আপনারাও দিন, মনখারাপ সরিয়ে রেখে।

গাঁয়ের মোড়ল এতোয়া মুন্ডার পাঁচটি ছেলে, একটি মেয়ে। ভাইবোনে ভারি ভাব। সবাই সবার খেয়াল রাখে, সবাই সবাইকে চোখে হারায়। মোড়লের ব্যাটার কাজের অভাব নেই। রাত ফুরিয়ে সিংবোঙ্গা জাগলেই পাঁচভাই বেরিয়ে যেত কাজে। যেখানেই যেত, বোনের জন্য হাতে করে কিছু না কিছু নিয়ে আসত। বোনও জানত ভাইয়েরা খিদে পেটে ঘরে ফিরবে তাই বেলাভর জঙ্গলে ঘুরে শাক, বনকরলা, কচুর মুখি যোগার করত, পাগাড় ডোবা থেকে তুলে আনত মাছ আর গুগলি শামুক। তারপর ভাইদের জন্য তরিবত করে সেসব রেঁধেবেড়ে রাখত। শাকভাতে মাছভাতে ভালই দিন কাটছিল তাদের।

একদিন শাক তুলে এনে কাটতে বসেছে, হঠাৎ বোনটির আঙুলে কাটারি লেগে রক্তারক্তি। টপটপ রক্ত ঝড়ে শাকও মাখামাখি। তাড়াতাড়ি সে শাকগুলো নিয়ে ঝোরার জলে ভাল করে ধুয়ে এনে রান্না করল। ভাইয়েরা ফিরে এসে শাকভাত খেয়ে আঙুল চাটে পাত চাটে, আশ তবু মেটে না। শাক তারা রোজই খায়। কই, এমন স্বাদ তো কখনও পায় না। ব্যাপার কী?

বার বার জনে জনে প্রশ্ন করে বোনকে, আজ সে কী দিয়ে শাক রেঁধেছে? বোন একই উত্তর দেয়, তেল নুন মরিচ, রোজের মতই। হঠাৎ এক ভাই দেখল, বোনের আঙুলে পট্টি বাঁধা।

ওটা কী? ভাইটি জানতে চাইল।

বোন বলল, শাক কাটতে গিয়ে আঙুলে কাটারি বসেছে।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করে পাঁচ ভাই। তার মানে বোনের রক্ত লেগে শাকে অত স্বাদ হয়েছে। খাওয়া শেষ করে গোপনে পরামর্শ করতে বসল পাঁচজন, বোনের রক্তে এত স্বাদ! মাংসে আরও না জানি কত। অতএব বোনকে মেরে মাংস খেতে হবে।

বাগড়া দিল ছোট ভাই। সে ওসব পাপকাজে নেই। অত আদরের বোন, তাকে মারা যায় নাকি।

তবে তুই না খেয়ে থাকবি। —না খেয়ে থাকব কোন দুঃখে, নদী থেকে কাঁকড়া তুলব। তরকারি রেঁধে খাব। —তাই খাস।

পরদিন বোনকে ভুলিয়ে ভালিয়ে জঙ্গলে নিয়ে গেল ভাইয়েরা। তারপর নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল ফুলের মতন মেয়েটিকে। চামড়া ছাড়িয়ে মাংস কেটে রেঁধে খেয়ে হাড় আর যত উচ্ছিষ্ট সব জঙ্গলে ফেলে দিল। ছোটজন কাঁকড়ার তরকারি খেল চোখের জল মুছতে মুছতে। বুরুবোঙ্গা, মারাংবুরু না জানি কী অভিশাপ দেবেন, না জানি কত দুঃখ নেমে আসবে তাদের জীবনে।

কিছুদিন পরপর জঙ্গলে যায় ছোটভাই, যেখানে বোনকে হত্যা করা হয়েছে সেখানে ঘুরঘুর করে। তার কেবল মনে হয়, ওই হাড়গোড়গুলি একদিন জুড়ে যাবে, রক্ত মাংস চড়বে আর বোনটি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবে হাসি মুখে। কিন্তু তা হয় না। ভাইটি মুখ কালো করে ঘরে ফেরে।

একদিন রাতে খুব ঝড় বৃষ্টি হল। সকাল হতেই ছোটভাই দৌড়ে গেল জঙ্গলে। গিয়ে দেখে যেখানে বোনের হাড়মজ্জা ফেলা হয়েছিল সেখানে রাতারাতি একটি তলতা বাঁশগাছ গজিয়েছে। এ বাঁশ যেমন ফাঁপা তেমনি পাতলা। আগপাছ না ভেবে ছোটভাই বাঁশটি কেটে নিয়ে এল। তারপর চমৎকার একটি বাঁশি তৈরি করল।

আশ্চর্যের কথা, সেই বাঁশিতে ফুঁ দিতেই বেজে উঠল অদ্ভুত এক সুর। সে সুরের এমন কুহক, বাজাতে বাজাতে ছোটভাইয়ের বুকে ধুপধুপ ঢেঁকির পাড়। যেন বোনের আত্মা কাঁদছে। যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে রক্তখেকো ভাইদের অপকর্ম।

চারভাইয়ের কানেও গেল সে বাঁশির সুর। অনুতাপে জ্বলতে থাকল তারা।

সেই থেকে ছোটভাইয়ের সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে উঠল সেই বাঁশি। একমাত্র সেই জানে বাঁশিটি তার হারিয়ে যাওয়া স্নেহের বোন।

সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য

পাঠকের পর্যটন

মালঙ্গী পাড়ের বৃত্তান্ত

মধুছন্দা মিত্র ঘোষ

আলতো ছুঁয়ে যায় অরণ্যভূমের ওই বেবাক হাতছানি। ক্ষীণকায়া মালঙ্গীর নদীজল ও সবুজ গাছেদের গরিমা। চেনা টান আছে বলেই ইঙ্গিতময় সেই হাতছানি গড়ে দেয় আমার কুয়াশার এই মায়াবী সফর। তরাইয়ের জঙ্গল যতটা নিবিড়— গভীরও। কতবার যে ছুটে ছুটে চলে গেছি উত্তরবঙ্গের অফুরন্ত সবুজের বিস্তারে, চা-বাগিচার আলপনা আঁকা মধুর পথে, নদীসমূহের জাল বোনা অরণ্যভূমে। মালঙ্গী নদীর লাবণ্য ঘেঁষা প্রকৃতি সম্ভারে কেবলই এপাড়ে গান, ওপারে গান। জঙ্গলের নিজস্ব ঠমক ও চিরহরিৎ। পাখির কুজন, মালঙ্গী নদীটার প্রতি বাড়তি কৌতুহল, বন-আবাস, বৃংহন, ঝিঁঝিঁ ডাক, লতাগুল্মময় বুনো ঘ্রাণ, শ্বাপদ— এসবই আমার ডায়েরির পাতায় নিসর্গভিত্তিক কিছু টুকে রাখা আলোচনা মাত্র।

দার্জিলিং মেল, তিস্তা তোর্সা, উত্তরবঙ্গ, পদাতিক এক্সপ্রেসে নিউ জলপাইগুড়ি কিংবা কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে নিউ মাল, মাল বা হাসিমারা স্টেশনে নেমে ভাড়া গাড়িতে বরদাবাড়ির মালঙ্গী লজ। পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের বন আবাস। বাতানুকুল ও সাধারণ দুই ধরনের ঘরই রয়েছে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ— ৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, অষ্টম তল, কলকাতা- ৭০০০১৩। মনে রাখা জরুরি—

১৬ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর অভয়ারণ্য বন্ধ থাকে। উপযুক্ত পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হবে।

দু' দণ্ড জিরেন নিই মালঙ্গী পর্যটক আবাসে। রোজনামচা যাপন ছেড়ে চমৎকার বিশ্রাম। মালঙ্গীর তুমুল নীরবতায় দুই দিনের নিশিযাপন। অরণ্যের ভাঁজে ছায়া, কখনও একফালি রোদের আরাম। হেমন্তের পড়ন্ত বিকেলে জঙ্গুলে বাতাবরণের মৌতাত নিচ্ছি তারিয়ে তারিয়ে। ক্রমে সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে টের পাইনি। পা ঝুলিয়ে বসে আছি বন আবাসের কিছুটা বাইরে হাতিতে চড়ার জন্য সিমেন্টের সিঁড়িতে। অক্লান্ত ঝিঁঝিঁ ডাক ছাড়া

অনন্ত মৌনতা চরাচর জুড়ে। বেশ লাগছে। এমন মনমৌজিতে বুঁদ হয়ে কাটাব বলেই তো এই দু'দিনের অরণ্যভ্রমণ। সন্ধে আরও খানিকটা গাঢ় হতে না হতেই বন আবাসের দায়িত্বে থাকা চৌকিদার হাজির হয়ে মিঠে ধমক দিয়ে হোটেল ঘরে তৎক্ষণাৎ ফেরৎ পাঠালেন। ভয়ও দেখালেন, গন্ডার, বাইসন, হাতি প্রভৃতি পেল্লাই আকারের তৃণভোজি প্রাণীরা বনআবাসের হাতায় কখনও কখনও চলে আসে। এই তামাম জঙ্গলেই ওদের স্বাভাবিক বিচরণভূমি। বন আবাসটি যথেষ্ট নিরাপদ চত্বর হলেও এখানে সন্ধে রাতে থাকা ঠিক নয়। নিরিবিলিটুকু উপভোগ করছিলাম। শিরদাঁড়া চুঁইয়ে গড়িয়ে এল অপ্রাকৃত শিরশিরানি। একটু হলেও ভয় তো পেয়েছিই। সন্ত্রস্থ হয়ে ঘরে ফিরে আসি।

ঘরের ব্যালকনিতে কফি মগ নিয়ে আয়াস করে বসি। কুয়াশার সান্ধ্য আবছায়ায় মালঙ্গী লজের পরিশীলিত বাগান, ফাঁকা দোলনা, শূন্য বেঞ্চ, কমলা-হলুদ টালি বিছানো পথ, তদারকি করে গোছানো ঘাসের মখমলি সবুজ লন, কেমন মায়াবী হয়ে আছে। ওই সুদূরে মালঙ্গী নদী, গাছের ফাঁক গলে চেনা দৃশ্যময়তায়। নেশাতুর পরিবহ। অরণ্যযাপনের সহজিয়া সফরে ঘোর লেগে থাকে পর্যটনবিলাসী মনে। এবং আমার সাবেকি বিস্ময়গুলো নিয়ে দিশেহারা হয়ে যাই। সফর পৃষ্ঠাটা ভরে ওঠে।

৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক চলে গেছে আলিপুরদুয়ারের দিকে। আজ সকালে আসার আগে পথে এক চমক জমে ছিল। এই দেখ, এখন সেকথা লিখতে যেয়ে 'চমক' শব্দটা ব্যবহার করলাম বটে, কিন্তু সেই মুহূর্তে সেটা ছিল আল্টপকা অভিজ্ঞতা। ওই চাপা উৎকণ্ঠা আর রোমাঞ্চের মিলমিশ আর কী। আসলে হয়েছে কী, নাগরাকাটা পেরিয়ে বানারহাট রোড। সেখানেই জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রেখেছে সপার্ষদ এক মাকনা হাতি। এই মাকনা হাতিরা রেগে গেলে খুব ভয়ানক। গাড়ির অপেক্ষা চলছে সার দিয়ে। গাড়িগুলো ক্রমে জমে যাচ্ছে। গাড়ি ঘোরানোর জায়গাও নেই। হাতিগুলোর অবশ্য মোটেও ভ্রুক্ষেপ নেই। সে এক কাণ্ড বটে। ড্রাইভারদের জটলায় কানাঘুষো শুনলাম, গত রাতে নাকি কাছের এক বনবস্তিতে হাতির তাণ্ডব হয়ে গেছে। গাঁয়ের লোক ক্যানেস্তারা পিটিয়ে তখনকার মত তাদের ভাগায়। এরা খাবারের সন্ধানে খেতখামারে ঢুকে পড়ে। খানিক হামলা চালিয়ে তারপর শান্ত হয়ে ফিরে যায়। দল বেঁধে রাস্তা পারাপার করে যখন তখন।

শাল, খয়ের, লালি, টুন, বয়েরা এসব নিয়েই জলদাপাড়ার রাজত্ব শুরু। ডানহাতি পথটা দক্ষিণ খয়েরবাড়ি 'টাইগার অ্যান্ড লেপার্ড রেসক্যু সেন্টার'। এটি মূলত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ও লেপার্ড-এর জন্যই খ্যাত। সার্কাস থেকে বন্যপ্রাণীদের খেলা দেখানো বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে তাদের কিছু জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয় কিছু এখানে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। খয়েরবাড়ি অরণ্য চিরে বয়ে গেছে বুড়ি তোর্সা নদী। তাতে নৌবিহারের ব্যবস্থাও মজুত। ব্যাটারিচালিত গাড়ি খয়েরবাড়ি জঙ্গল সাফারি করায়।

ইতিমধ্যে তোর্সা নদীর সেতু পেরিয়ে এসেছি। এ নদীর এপারে জলদাপাড়া ওপারে চিলাপাতা। দুটিই তুখোর জঙ্গল। আমাদের এইবারের জঙ্গলযাত্রায় দুটিই তালিকাবদ্ধ করা আছে। তোর্সার নুড়ি বিছানো জলরেখা পেরিয়ে গন্ডার ও অন্য বন্যপ্রাণীরা আকছার যাওয়া-আসা করে। এসবই ওদের সাবেক পথচলা। দূরে দিগন্তে গা এলিয়ে ভুটান পাহাড়। সেখান থেকে ফুন্টসোলিং প্রবেশ পথ টপকে ভুটান রাজ্যের ঠিকানা। মৃদুভাষ আলাপের ইচ্ছে নিয়ে ওই নীল আকাশ সবুজ পাহাড়। আমাদের গন্তব্য ও পথে নয়। খানিক পথ এসে এই তল্লাটটির নাম বরদাবাড়ি। সামনে বায়ুসেনার ঘাঁটি। এখান থেকে পথটা ভাগ হয়ে একটা চলে গেছে গুয়াহাটি। অন্য পথটি আমাদের পৌঁছে দিল মালঙ্গী বন আবাসের একেবারে দোরগোড়ায়।

ক্রমে সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে টের পাইনি। পা ঝুলিয়ে বসে আছি বন আবাসের কিছুটা বাইরে হাতিতে চড়ার জন্য সিমেন্টের সিঁড়িতে। অক্লান্ত ঝিঁঝিঁ ডাক ছাড়া অনন্ত মৌনতা চরাচর জুড়ে। বেশ লাগছে। এমন মনমৌজিতে বুঁদ হয়ে কাটাব বলেই তো এই দু'দিনের অরণ্যভ্রমণ।

এখান থেকেই সাজানো গোছানো জলসাঘরে আমাদের দুই রাতের অস্থায়ী আস্তানা। জলদাপাড়া জঙ্গল সাফারির প্রতিদিনের যে নির্ঘন্ট— তার প্রথম অংশীদার অবশ্যম্ভাবী জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের পর্যটক প্রিয় সেরা ঠিকানা হলং বন আবাসের আবাসিকদের। দ্বিতীয় মাদারিহাট লজের আবাসিকদের জন্য বরাদ্দ। আর সবার শেষে 'ছাগলের তিন নম্বর ছানার মত' সে সুযোগ মেলে মালঙ্গী লজের পর্যটকদের। হাতে গোনা ওই ক'টি তো জিপ ও হাতি। পর্যটক বেশি থাকলে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। মালঙ্গী বন আবাসের ম্যানেজার আশ্বস্থ করে বলে রেখেছিলেন, গন্ডার কিন্তু মালঙ্গী বন আবাস চত্বর থেকেও দেখা অসম্ভব কিছু নয়। এক শৃঙ্গী গন্ডার দেখব বলেই তো এসেছি। মালঙ্গী নদী পাড়ে পূর্ণবয়স্ক গন্ডাররা শাবক নিয়ে ইচ্ছে মতন চলে আসে। সেই শুনেই অকারণ উচ্ছ্বাসে মন লুটোপুটি।

প্রকৃতি খুব কাছ থেকে একান্তে পেতে, মন তো চাইবেই। বারান্দায় ঝিরঝিরে একটা হাওয়া দিচ্ছিল। মোবাইলে টাওয়ার এই আছে এই নেই। নেট সংযোজনও বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। এই বেশ ভাল। নেই তাই রক্ষে। যতই সংযত হওয়ার বৃথা চেষ্টা করি, ইতিমধ্যে মোবাইল ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলো ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপে পাচার করে— সেই সুবাদে ক'টা লাইক ক'টা কমেন্ট এল সেই নিয়ে উসখুস্ করত আঙুলগুলো। শুধুমাত্র নিপাট বুনো গন্ধের নির্যাস ও নির্জন নির্জন অরণ্য আবহে থাকব বলেই তো এখানে আসা। নদী জঙ্গল কুয়াশা বনজ মৌতাতে সুক্ষণ এক একটি অধ্যায়।

জলদাপাড়া হলংয়ের দিকে না গিয়ে ভিন্ন পথে মেঠো ট্রেল ধরে জিপ সাফারিতে এলাম নজরমিনার। ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে চোখ মেলে জঙ্গলের বানজারা রূপ। নিবিড় বন। জলা পেরিয়ে গন্ডার দম্পতি কিছুটা কাছে এল। দাঁড়িয়ে রইল। তারপরই ওই জলায় চুপলুস কাদায় শরীর ডুবিয়ে দিল। আমাদের অনুসন্ধানী চোখ ও মন সচল হয়ে রইল ওই তুখোর মুহূর্তকে আগলে রেখে। ছায়ারোদের নিরালায় সে এক অকাতর পাওয়া। যথেচ্ছ তীক্ষ্ণভাবে ডেকে উঠল ময়ূর। লাজুক মোড়ক খুলে একটু একটু করে প্রকাশিত হচ্ছিল মালঙ্গীর জঙ্গলের মুগ্ধ মনস্কতা। ভ্রমণ অভ্যাসে জাপটে ধরি প্রকৃতির নিরন্তর চমক।

দুপুরে বন আবাসের বারান্দায় বসে লিখে ফেলি আস্ত একটি কবিতা— নাম রাখি 'তরাই'

তুমি তো অরণ্যই দেখ নি কখনও
বন-আবাস, বৃংহণ, ঝিঁঝিঁ ডাক,
লতাগুল্মের বনজ ঘ্রাণ, শ্বাপদ—
অচেনা সবই তোমার কাছে

নতুন গল্প নেই কোনও
হারাতে চেয়েছি পথ
তরাই-এর জঙ্গলে।

পাঠকের পর্যটন

গজলডোবা হাওয়া মহল

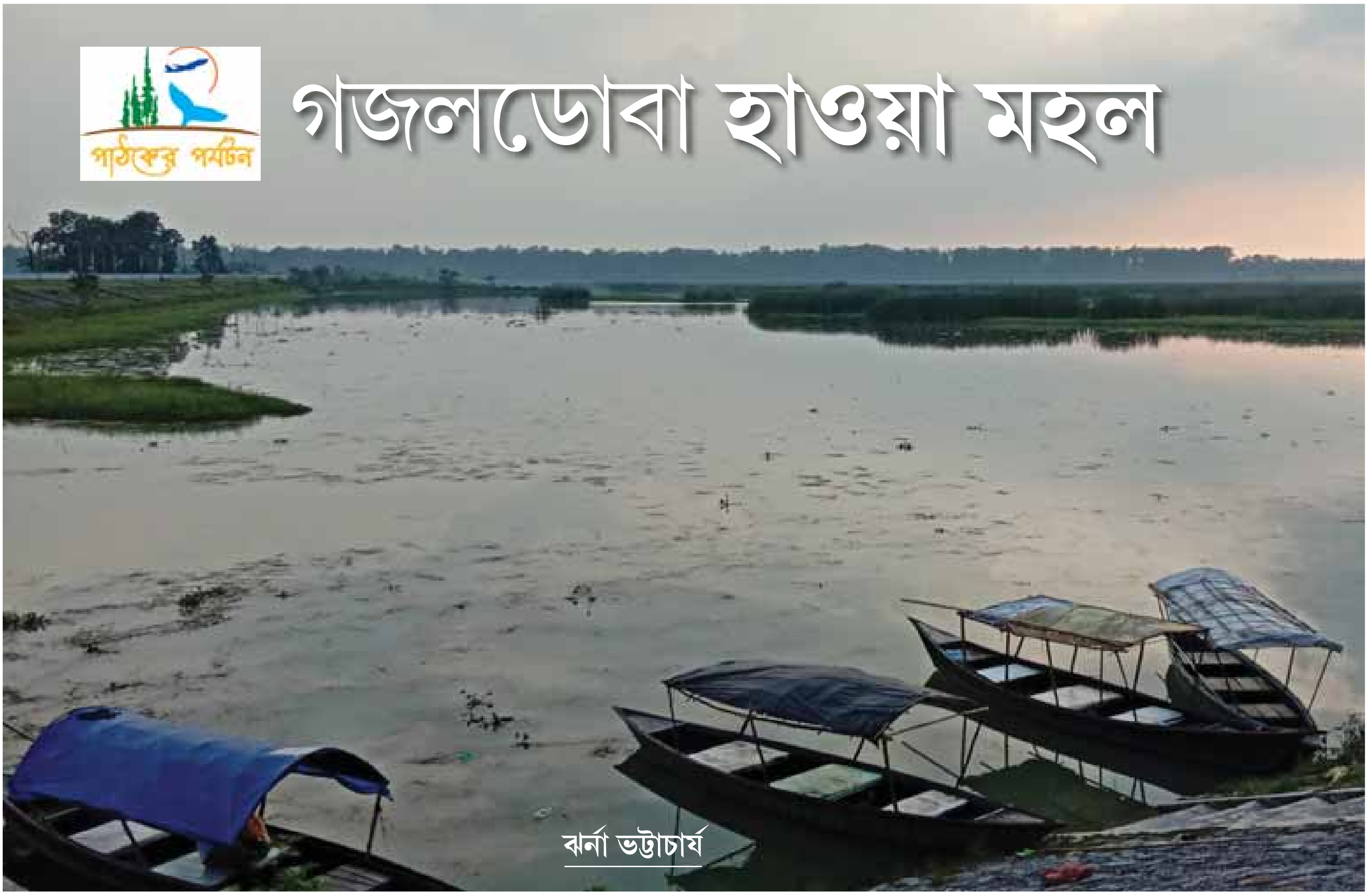

ঝর্না ভট্টাচার্য

মূর্তি থেকে রওনা হয়ে বাতাবাড়ি, বড়দিঘি, এরপর গরুমারা জাতীয় উদ্যান। জঙ্গলের মধ্যে ভয়ে ভয়ে আমরা নেমে পড়ি। মহাকাল বাবার মন্দির, জায়গাটা খুব রোমাঞ্চকর। সেখানে মানুষজন ফুল, ধুপকাঠি জ্বালিয়ে পুজো দিচ্ছিল। চারিদিক বর্ষাভেজা সবুজ ঘন জঙ্গল ও নির্জনতা, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ও নানা ধরনের পাখির ডাক শুনতে খুব ভাল লাগছিল।

এরপর আমরা লাটাগুড়ি পৌঁছাই। পরানদা আমাদের জন্য পথের সাথী ব্যবস্থা করেছিলেন। দুই দিন ছিলাম। দুই দিনই আমরা জঙ্গলে ঘুরেছি। লাটাগুড়ি এখন প্রায় শহরের মত, লাইট ঝলমলে ও প্রচুর দোকানপাট।

তৃতীয় দিন সকালবেলা প্রাতঃরাশ সেরে রামপ্রসাদের গাড়ি নিয়ে গজলডোবায় হাওয়া মহলের উদ্দেশে রওনা হই।

লাটাগুড়ি থেকে ক্রান্তি মোড়, ধরলা, চেকেদায় ভান্ডারী, যোগেশচন্দ্র চা-বাগান ও কাঠামবাড়ি জঙ্গল হয়ে তিস্তা ব্যারেজের দিকে এগোই। বাইরে রোদের তাপ আছে। দূর থেকে আমরা নীল-সাদা রঙের হাওয়া মহল দেখতে পেলাম। যেন রাজহংসীর মত দাঁড়ানো। আমার তখন মাইথনের কথা মনে পড়ছিল। রামপ্রসাদ আমাদের হাওয়া মহলের গেটে নামিয়ে লাটাগুড়ি ফিরে গেল।

হাওয়া মহলের তিন তলার বাঁ দিকের ঘর, কেয়ারটেকার নিতাই খুলে দিয়ে ও এসি চালিয়ে দিয়ে নীচে গেল। আমাদের জন্য চা-টিফিন নিয়ে এল। বারান্দার দরজা খুলে ছোট ব্যালকনি। তিস্তা ব্যারেজের জলাধার নীল রঙের জলরাশি দেখতে দারুণ লাগছিল।

জেলেরা বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট মাছ জাল ফেলে ধরছিল। লোকজনও চলাফেরা করছে। রাতের আলোয় তিস্তার জল চিকচিক করছিল। দারুণ সুন্দর লাগছে। চারদিকে চওড়া চওড়া রাস্তা। রাতে লাইট জ্বললে দারুণ সুন্দর লাগে। মনে হয় যেন স্বর্গপুরী। চারদিকে দারুণ সুন্দর সুন্দর গাছ লাগানো হয়েছে।

হাওয়া মহল তৈরি হয়েছে সেচ দপ্তরের কল্যাণে। যারা কর্তাব্যক্তি তারাই বেশিরভাগই এসে থাকেন। দোতলায় একটি হল ঘর আছে। সেখানে সেচ দপ্তরের বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। উর্দ্ধতন ব্যক্তিরাও উপস্থিত থাকেন।

দুপুরে আমরা খাওয়াদাওয়া করতে যেতাম পরিমলদার 'বোরোলি' রেস্তোরাঁতে। এখানে রয়েছে নানাবিধ ফল ও ফুলের বাগান, বড় পুকুরও আছে। বিভিন্ন রকমের মাছ আছে এতে। গজলডোবায় বিখ্যাত বোরোলি কুলীন মাছ। সকাল ও বিকেলে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, লাটাগুড়ি ও ওদলাবাড়ি থেকে বহু মানুষ চারচাকা ও দু'চাকা নিয়ে বোরোলি মাছ কিনতে চলে আসে।

জেলেরাও চালাক, বোরোলি হাজার টাকা কিলো দরে বিক্রি করে। তাও আবার কপালে থাকলে। না পেয়ে আফশোষ করে ফিরে যায়। পরিমলদার বোরোলি রেস্তোরাঁর প্রতিটি ডিশ অতুলনীয়। অসাধারণ কুইজিন। প্রতিটি পদ অতি যত্ন সহকারে তৈরি হয়। রেস্তোরাঁর পাশেই লজ তৈরি হচ্ছে, প্রায় সমাপ্তির পথে। দারুণ সুন্দর।

দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর পরিমলদার গাড়িতে গজলডোবায় ভোরের আলো, পক্ষী বিতান,

নৌবিহার ও কটেজ পুলের ভিতরে ঢুকে বেড়াই। খুবই আরামপ্রদ। বিকেলের দিকে সরস্বতীপুর চা-বাগানে যাই, সন্ধেবেলায় পরিমলদা আমাদের হাওয়া মহলে পৌঁছে দেয়। সন্ধেবেলায় হাওয়া মহল যেন স্বর্গপুরী।

ব্যালকনিতে বসে চা খাই। হঠাৎ ঝড় ওঠে, সেও এক দারুণ দৃশ্য। গাছপালা যেন লুটোপুটি খাচ্ছে।

ঝড়-বৃষ্টি থামার পর কে যেন দরজায় কড়া নাড়ছে। খুলে দেখি বন দপ্তরের পোশাক পরা লোকজন। ওনারা আমার স্বামীকে বললেন— স্যার, রেঞ্জার সাহেব গাড়ি পাঠিয়েছেন, আপনাদের নিয়ে জঙ্গলে যাব।

রাত দশটা, তাই আমি খুব ভয় পাচ্ছিলাম। তবু ওনাদের সঙ্গে গাড়িতে বেরিয়ে পড়লাম, বৃষ্টিস্নাত ঝলমলে আলোয় গজলডোবাকে দারুণ সুন্দর লাগছিল। এ এক বিরলতম অভিজ্ঞতা। ঘণ্টাখানেক জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। বেশ রোমাঞ্চকর বলাই বাহুল্য। রাত ১১টায় ফিরে এলাম।

নিতাই হটপটে গরম পরোটা, তরকারি ও দুধের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। খাওয়াদাওয়ার পর ব্যালকনিতে বসে থাকাটা হাওয়া মহলের সেরা পাওনা। তিস্তাকে নিবিড়ভাবে পেতে গেলে চুপচাপ

বসে থাকতে হয় ঘন্টার পর ঘন্টা। সারাটা দিনের কোলাহল থেমে গিয়ে গজলডোবা তখন নিথর, নীলচে আলো আর কুয়াশার চাদর গায়ে দাঁড়িয়ে। কানে আসে কেবল তিস্তার বয়ে চলা।

হইহল্লা নয়, প্রকৃতিকে একান্তে পেতে চাইলে আপনিও একটি রাত কাটিয়ে আসতে পারেন হাওয়া মহলে। শিলিগুড়িতে শক্তিগড়ে বড় রাস্তার ওপারে সেচ দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের দপ্তরে খোঁজ করতে পারেন।

বউ সাথে পথে পথে। পর্ব-৫

স্মৃতির দুয়ারে দুয়ারে ফিরি আলিপুরদুয়ারে

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

কোথায় লেজ আর কোথায় মাথা? গুছিয়ে গাছিয়ে সব কি হুড়মুড়িয়ে লেখা যায়? স্মৃতি মাঝে মাঝে বিশ্বাসঘাতকতা করে। কোনও নদী, লজ, মেঠোপথ, জঙ্গল, জানালার ধারে বসা নীলকণ্ঠ পাখি মাঠে ঘুরে বেড়ায় হাট্টিমাটিমটিম। স্বজনরা, বন্ধুরা কোথায় চলে গেল। মাঝে মাঝে মনে পড়ে। গিন্নির সঙ্গে আলিপুরদুয়ারে আসা মানে আমার আত্মার স্বজনবন্ধুদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া। কবি, লেখক, না হলে সস্তার হোটেলে ছিল একসময় রাত্রি যাপন। বিবাহের পর ভায়রার বাড়ি। সেখানে আবার বিভিন্ন রকমের সাংসারিক গালগল্প, অভাব-অভিযোগ, পরচর্চা যা আমার একেবারেই ভাল লাগে না। যত বোঝাই তুমি থাক তোমার মত আর আমাকে আমার মত চলতে ফিরতে দাও— কে শোনে কার কথা। কাকস্য পরিবেদনা। —আমিও তোমার সঙ্গে যাব। বেশ তাই হোক। ভাল লাগে তো তিনুদার প্রেস, জগন্নাথদা, হাটখোলার নিতাই কবিরাজ। একটা সময়ে জগন্নাথদার কাঠের দোতলার নীচে আমার থাকার ব্যবস্থা ছিল। ওপরে খাওয়াদাওয়া। সেই আদ্যিকালের কাঠের দোতালাটি এখনও আছে। হেরিটেজ আলখাল্লা ঝুলিয়ে। সত্যি কথা বলতে কি জগন্নাথদার সঙ্গেই বা তাঁর মাধ্যমে আমার আলিপুরদুয়ারে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে ওঠে। এমনকি রাজেন পান্ডের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র কিন্তু জগন্নাথ বিশ্বাস।

শহরটি মোটেও দর্শনীয় নয়। পরিচিত মহল্লা এপ্রান্তর থেকে আরেক প্রান্ত, শামুকতলা রোড, চৌপথি, বক্সা ফিডার রোড, মায়া টকিজ, কমলা টকিজ এই সব সিনেমা হলগুলির ছিল সেই সময়ের বিনোদনের জায়গা। আজ একেবারে ভূতুড়ে বাড়ি। প্রথম আলিপুরদুয়ার দর্শন একেবারে সাবালক বয়সে। আমার মাসির সঙ্গে মিটার গেজ ট্রেনে কোচবিহার যাবার পথে আলিপুরদুয়ারে দুই রাত্রি থাকা।

আলিপুরদুয়ার সেই সময় একেবারে মফঃস্বলী গন্ধ। গ্রামগঞ্জের মত লাগত। টিনের ছাউনি দেওয়া ঘরবাড়ি, দোকানপাট, একতলা দোতালা কাঠের বাড়িঘরই ছিল বেশি। গামা মহন্ত, লালু মহন্তর মিষ্টির দোকান রমরমিয়ে চলত। এখন গামা মহন্তর দোকান চললেও লালু মহন্তর দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। গামা বেঁচে আছে। আমার কাছে সব থেকে পছন্দের জায়গা ছিল কলেজ হল্ট থেকে প্যারেড গ্রাউন্ড, সার্কিট হাউস এলাকা। ছায়াঘন পথ, কত কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, জারুল, অমলতাসের শোভা। আমাদের আড্ডাস্থল ছিল তিনুদার প্রেস না হলে খোকনের চারুমুদ্রণ। অন্যথা বাজারে কানাইয়ের দোকান বা খোলটার কালজানি নদী পেরিয়ে নেভিদার বাড়িতে।

সমস্যা হত গিন্নিকে বগলদাবা করে আলিপুরদুয়ারকে বুড়ি করে কাছে দূরে বেড়ানো। গ্রামেগঞ্জে, পোড়োমন্দিরে, মসজিদে ঢুঁ মারা। স্থানীয় মানুষজনদের কথা দেখবার কিছু নাই। যেমন বিষ্ণু মন্দির, বনচুকামারির মসজিদ আরও অনেক কিছু। প্রথম দিকে পুরনো বাজারের যেখানে শাক-সবজি মাছের আড়ত গন্ধে ভূত পালায় সেখানে ছিল নড়বড়ে কাঠের একতলা প্ল্যাঙ্কিংয়ের লজঝর রাজেন পান্ডের বাড়ি। ১৯৯৩-এর বন্যায় ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেছে। বন্যার সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলা কঠিন। রাজেনের বাড়িতে একবার নয় বহুবার থেকেছি, খেয়েছি, আড্ডা মেরেছি। কখনও সস্ত্রীক, কখনও জগন্নাথদার সঙ্গে।

পূর্ব ডুয়ার্সের আনাচকানাচে বেড়ানোর নিখাদ নির্ভরযোগ্য সঙ্গী ছিলেন রাজেন। পুত্র কন্যারা তখন বলা যায় শিশু। পান্ডে ওদের প্রকৃত শিক্ষায় শাসনে বড় করে তোলে। এখন ওরা সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক, বিয়ে-থা করে সংসারী। দুঃখ হয় অকালে দুম করে রাজেনের চলে যাওয়া। এমন সুন্দর ভ্রমণ সাথী আমার ভ্রাম্যমান জীবনে আমি বেশি পাইনি। আজকাল বেড়ানোর কথা কাউকে বললে নানা অছিলা, বাহানায় সটকে পড়ে। গতবছর হাটের হট্টগোলের মধ্যে রাজেনের বাড়িতে দু'জনে যাই। স্ত্রী আর পুত্রবধূ তখন বাড়িতে। কতকাল পরে দেখা। ঘরবাড়ির আমূল পরিবর্তন। রাজেনের স্ত্রী ভীষণ খুশি আমাদের দু'জনকে পেয়ে। জেঠি এবং জ্যাঠাকে কীভাবে সেবা করবে রাজেনের পুত্রবধূ ভেবে পাচ্ছে না। রাজেনের স্ত্রী বলে— দাদা ছেলে কর্মস্থল থেকে ফিরে এসে যখন শুনবে আপনারা এসেছিলেন— মনে বড় কষ্ট পাবে। দুপুরে থাকুন। খাওয়াদাওয়া করে যাবেন। বললাম— বাইরে টোটো দাঁড় করিয়ে রেখেছি। তোমাদের এখান থেকে যাব জগন্নাথদার বাড়ি ছুঁয়ে কমলেশের বাড়ি। শুনেছি কমলেশ খুবই অসুস্থ।

বন্ধুবর কমলেশের বাড়ি যেতে দেখা হয়ে গেল ডুয়ার্স সমাচারের রমেনের সঙ্গে। বলে— ও গৌরীদা, কবে এসেছেন আলিপুরদুয়ারে। আমাদের ওখানে যাবেন না? বললাম— এযাত্রায় হয়ত হবে না। আবার এলে যাব। সুপারি বনের মধ্যে দিয়ে কিছুটা ঢালু পথে গেলে মাঙ্গলিক অর্থাৎ কমলেশের বাড়ি। শ্রীমান অরুণাভ এখন কবিতায় সাবলীল বিচরণ, বারান্দায় দাঁড়ানো। ভেতরে ঢুকে দেখি লেপ-কম্বলের ভিতরে শরীরের শুধু মাথাটুকু বের করা। আমাদের দেখে বলল— গৌরীশঙ্কর উঠতে পারব না। শরীর খুব খারাপ। রুম হিটার চলছে। কমলেশের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম কবে থেকে এই অবস্থা। বাবাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুই থাকবি তো? না গো জ্যেঠু কত কাজ! আমাকে কলকাতায় যেতেই হবে। লোহালক্কর স্ট্রিট থেকে বাবাই এখন বাইপাসের কাছে। কলকাতা ২৪ সাতদিন কীসব বোঝাল। এসব নিয়েই পড়ে আছে। বেশি না বোঝাই ভাল। কমলেশ আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। মনে পড়ে এই কমলেশকে নিয়েই কত শতবার জগন্নাথ দর্শনে গেছি। সম্প্রতি সুলেখক তুষার চট্টোপাধ্যায় চিরকালের মত চলে গেল। এই চলে যাওয়াতে মাঝে মাঝে বড় নিঃসঙ্গতা, বিমর্ষতা, বিষাদ বোধ করি।

কমলেশের বাড়ি থেকে যাই হারু পালের বাড়িতে। নোনাই পত্রিকার একনিষ্ঠ সেবক। জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন রেল কলোনিতে। এখন সুবর্ণপুরের শেষ মাথায় বাড়ি করে বসবাস করছেন। সাহিত্য-সংস্কৃতি মাথায় উঠেছে। ভুলতে পারেন নি 'নোনাই'কে। আমরা দু'জন পুরনো দিনের ফেলে আসা স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসি। সেই মুড়ির টিনের গল্প। হারু গান ধরে পুরনো দিনের সেই দিনের কথা সেকি ভোলা যায়? আলিপুরদুয়ার থেকে ডিআরএম পর্যন্ত ম্যাটাডোর বাস চলত। মাথা নিচু করে ঢুকতে হত। সন্ধে সাতটার পর নিঝুম পথঘাট। এখন পিলপিল করছে টোটো, অটো। মনে পড়ে জয়ন্তীর অঞ্জন রায়, খোকা, মৃণাল, বাবুল, লেবুবাগানের বেণু, কৃষ্ণপ্রিয় আর শরৎ সরণিতে অর্ণব সেনের র কথা। ম্যাকউইলিয়মের ক্যাম্পাসে সমীর চক্রবর্তী। আজ স্বর্ণঝরা দিনগুলি আবার যদি ফিরে আসত! তারাপদদার কথা মনে পড়ে। বিমলদা সেও চলে গেল অনেককাল আগে। সুধাংশুদাও নেই। একা কিংবা দোকা। তবু এখনও ঘুরে বেড়াই। সঙ্গী বলতে শিবুন, টাটু, জ্যোতি সারাদিনের জন্যে আলিপুরদুয়ারের কাছাকাছি হয় রাজাভাতখাওয়া, গরম বিট না হলে মেন্দাবাড়ি জঙ্গলে। এভাবেই এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছি। জানি না কতদিন এই পথ চলতে পারব।

ধারাবাহিক কাহিনি। পর্ব ৪

তাজ্জব মহাভারত

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

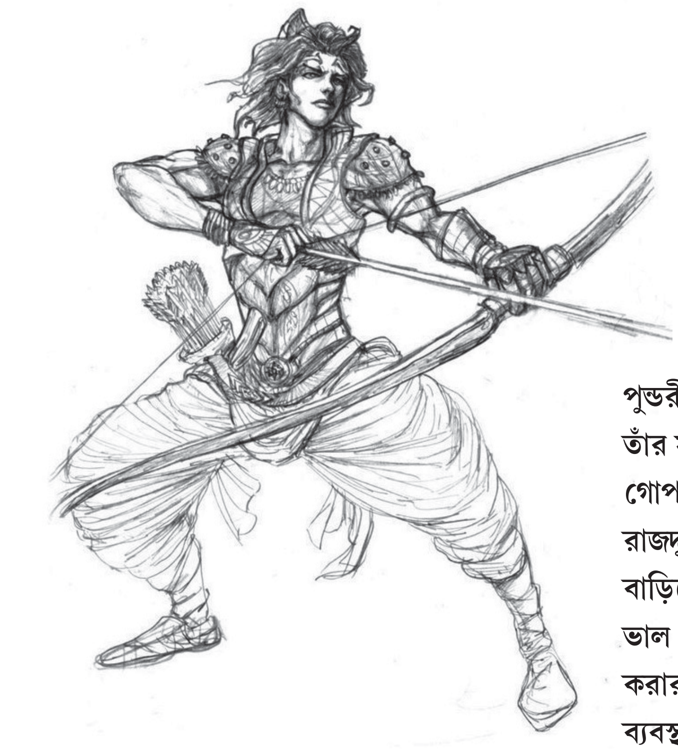

পুন্ডরীকাক্ষ ধুর্জটিবর্মার হাত থেকে কৌশলে পালিয়ে গেল ভুসুকু। তাঁর সঙ্গে দেখা হল যুধিষ্ঠিরের। প্রথম পান্ডব তাঁকে বললেন সব কিছু গোপন রাখতে। সাগরদেশের দূতাবাসে নজর রাখার জন্য কামরূপের রাজদূতকে অনুরোধ জানালেন যুধিষ্ঠির। এদিকে আবার উচ্চকপালের বাড়িতে এসেছেন দুর্বাসা মুনি। উচ্চকপালের মেয়ে মধুক্ষরা লেখাপড়ায় ভাল। কিন্তু কুরু-পান্ডবের মধ্যে বিভাজন ঘটিয়ে হস্তিনাপুরকে ধ্বংস করার পরিকল্পনাকে কী ভাবে গ্রহণ করছেন যুধিষ্ঠির। ভুসুকুর নিরাপত্তা ব্যবস্থা তিনি করেছেন। কিন্তু ভুসুকু কি আদৌ নিরাপদ? ভীমসেনকে মাছের ঝোলা রান্না করে পাঠালেও তাঁর সঙ্গে কবে সাক্ষাৎ হবে ভুসুকুর? কাহিনী চলছে —।

১৩

অল্লরাজ অঙ্গার একটি কাষ্ঠাসনে ধ্যানস্থ। সামনে নতমুখে দাঁড়িয়ে আছে পুন্ডরীকাক্ষ ধুর্জটিবর্মা। রাত্রি চতুর্থ প্রহরের দুই তৃতীয়াংশ পেরিয়ে গেছে। আকাশ ফর্সা হচ্ছিল। পূর্বদিক থেকে বালার্কের প্রথম আলো মুকমন্ডলে এসে পড়ামাত্র অল্লরাজের ধ্যানভঙ্গ হবে। পুন্ডরীকাক্ষ অপেক্ষা করছিল। গতরাতে সাগর দেশের দূতাবাস থেকে ভুসকুর পালিয়ে যাওয়ার কাহিনী অল্লরাজ জেনে গেছেন। গভীর রাতে পুন্ডরীকাক্ষই জানিয়েছিলেন লোক পাঠিয়ে। বিষয়টি গুরুদেব কী ভাবে গ্রহণ করবেন তা জানার জন্য দুরুদুরু বক্ষে অপেক্ষা করছিলেন পুন্ডরীকাক্ষ।

আলো এসে পড়তেই অল্লরাজ চোখ খুললেন। প্রসন্ন হেসে বললেন, 'বোসো।'

পুন্ডরীকাক্ষ প্রণাম জানিয়ে বসলেন।

'ভুল আমারই।' অল্লরাজ স্মিত হেসে বললেন। 'আমাদের একজনকে রাখা উচিত ছিল প্রহরায়। বজ্রপাতের প্রতি হস্তিনাবাসীদের ভীতির বিষয়টি আমার মাথায় রাখা উচিত ছিল।'

'সে বিষয়ে আমিও বিস্মৃত হয়েছিলাম গুরুদেব।'

'ছেলেটি সব দিক থেকেই উপযুক্ত ছিল। ভূতমিত্রের আশ্রমে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর ছেলেরা পড়ে। ভুসকুর মাধ্যমে ছেলেদের মধ্যে দুর্যোধনের অনুকূলে মতামত প্রচার করা সহজ হত। তাঁদের মাধ্যমে বিষয়টা হস্তিনাপুর ছড়িয়ে পড়ত সহজে।'

'আমরা কি তাঁকে পুনরায় অপহরণ করার চেষ্টা করব?'

'বিকল্প পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু দ্বিতীয়বার অপহরণ করতে হবে অতি সুক্ষ্ম কৌশলের সাহায্যে।'

'ছেলেটি কি আশ্রমের ফিরে গিয়ে ভূতমিত্রকে সব খুলে বলবে না?'

'সেটাই স্বাভাবিক। ভূতমিত্র যদি উদ্যোগ নেয় তবে রাজরক্ষীরা সাগর দূতাবাসে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আসতেই পারে। তখন কী বলবে?'

'অস্বীকার করা হবে।'

'একদম তাই।' অল্লরাজ হাসলেন। 'কাল রাতে যার প্রহরায় ছিল তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ আমি এরমধ্যেই পাঠিয়েছি। হস্তিনাপুর প্রশাসনের কাছে এই ঘটনার কোনও গুরুত্ব নেই। কিছুদিন পর সব ঠিকঠাক হলে আমরা আবার কাজে নামব পুন্ডরীকাক্ষ। ভুসকুকে আমার চাই। ওকে আমি মায়া বিস্তার করে বশ করব। এমন সম্পদ আর সুখের সন্ধান দেব যে ও বশীভূত হতে বাধ্য হবে। ভাল কথা, দুর্যোধনকে কতটা বোঝাতে পেরেছ তুমি? সে কি প্রস্তুত?'

'হস্তিনাপুর শাসন করতে পারলে সে খুশিই হবে। এ কথা সে স্বীকার করেছে। কিন্তু ভ্রাতৃবিরোধ এখনও তাঁর ভাবনায় নেই।'

'দুর্যোধনের মূল দুর্বলতা তাঁর অহঙ্কার। এটাকে প্রশ্রয় দাও। অহঙ্কার থেকে বিদ্বেষ আসতে সময় লাগে না পুন্ডরীকাক্ষ। আর সাবধান! যুধিষ্ঠির যেন ঘুণাক্ষরেও কিছু বুঝতে না পারে।'

'জানি।' পুন্ডরীকাক্ষ মাথা নাড়িয়ে বললেন।

'আর একটি সংবাদ কি তোমার কর্ণগোচর হয়েছে পুন্ডরীকাক্ষ?'

'কোন সংবাদ?'

'কামরূপের দূতাবাস প্রধান এসে সাগর দূতাবাসে জানিয়ে গেছেন তিনি একটি হাতি উপহার দিতে চান। সাগরদূত যেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন।'

'হাতি? সব দূতাবাসকেই দেবেন?'

'এ ব্যাপারে একটু মন দাও। যত শীঘ্র সম্ভব তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ কর।'

'কিন্তু সাগররাজের দূত সহ তাঁর সাতজন কর্মচারিকে তো আমরা অপহরণ করে হত্যা করেছি।'

'সে তথ্য হস্তিনাপুরের কাছে নেই। কাউকে দূত সাজিয়ে পাঠাও। শম্বুকের কথা ভাবতে পার। আমার মনে হচ্ছে শম্বুককে দূত সাজিয়ে এবার থেকেই সাগর দূতাবাসেই রাখতে হবে। ভূতমিত্রের অভিযোগে পেলে হস্তিনাপুর প্রশাসন থেকে সাগরদূতকে ডেকে পাঠান অসম্ভব নয়। অন্ততপক্ষে দূতের সঙ্গে কথা বলার জন্য তাঁরা লোক পাঠাতে তো পারেই!'

'আপনি অতি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিলেন। আমি

আজই ব্যবস্থা করছি।'

আরও কিছু আলাপের পর পুন্ডরীকাক্ষ বেরিয়ে এসে রথে উঠলেন। ঝলমলে প্রভাতকাল। ঠান্ডা হাওয়া বইছে। পথঘাট এখনও ফাঁকা ফাঁকা। পুন্ডরীকাক্ষ রথ ছোটালেন। শক্তিমান ঘোড়া দুটি বায়ুবেগে তাঁকে নিয়ে চলল নয় সংখ্যক রাজপথের দিকে। এই পথটি গঙ্গার দিকে যাওয়ার সময় অরণ্যের গা ঘেঁসে যায়। পথের শেষে গঙ্গাঘাটে শ্মশান। তার আগে অরণ্যের গায়ে অগ্নসের গৃহ। অগ্নসও একজন সৈন্ধব। কিন্তু হস্তিনাপুরে সে আছে মুনির ছদ্মবেশে। বেদবিদ্যায় তাঁর খুব ভাল ধারণা। নির্জনে নিজের গৃহে সে বেদের নতুন ভাষ্য রচনা করছে বলে সবাই জানে। এর জন্য কুরুরাজের পক্ষ থেকে নিয়মিত দক্ষিণাও পেয়ে থাকেন।

শম্বুক গোপনে অগ্নসের সঙ্গেই থাকে। তাঁর সংবাদ হস্তিনাপুরের জানা নেই।

অগ্নস গৃহেই ছিলেন। পুন্ডরীকাক্ষের বিষয়ে তিনি অবহিত থাকলেও পরিচয় ছিল না। সেটা জানার পর তিনি পুন্ডরীকাক্ষকে তাড়াতাড়ি ভেতরে নিয়ে একটি বিশেষ কক্ষে বসিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'কিছুদিন হল আমার পাশের জমিতে এক নবীন মুনি কুটির বানিয়ে থাকতে শুরু করেছেন। তাঁর নাম বৃহস্পতি। ব্যাটা ভয়ানক তার্কিক। বিশুদ্ধ জড়বাদী।'

'এতে সমস্যা কোথায়?'

'আমার কাছে কেউ এলেই তিনি তর্কে আহ্বান করেন আর অদ্ভুত সব যুক্তিজাল বিস্তার করে মাথা ঘুরিয়ে দেন।'

'বেশ। তর্ক আমি পছন্দ করি। শম্বুক কোথায়?'

'সে গোপনে আছে। সংবাদ দেব?'

'তাঁকে জানাও যে কাল থেকে সে সাগরদূত হিসেবে কাজ শুরু করবে। গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে কর্তব্য জেনে নিতে হবে। পারলে এখনই যাক।'

অগ্নস অনুচরকে নির্দেশ দিলেন। সে চলে যেতেই পুন্ডরীকাক্ষ বললেন, 'আমিও আর এখানে সময় নষ্ট করব না অগ্নস। তবে তোমার প্রতিবেশিকে দেখতে মন চাইছে। নবীন তার্কিক আমার আগ্রহের বিষয়। সে অসুর না অনসুর?'

'অনসুর এখন আর কেউ বলে না। ওরা নিজেদের আর্য বলে।' অগ্নস হাসলেন। 'বৃহস্পতি অবশ্যই আর্য। কিন্তু নাস্তিক।'

'বাঃ!' পুন্ডরীকাক্ষ যেন আমোদ পেলেন। 'আর্যমুনিরা তো নাস্তিক দেখলেই ভিন্ন পথ ধরেন।'

'আমাকে আর্যমুনি ভেবে সুযোগ পেলেই বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেন। তা আমি অবশ্য উপভোগ করি।'

কথা বলতে বলতে দু-জন বাইরে চলে এসেছিলেন। পুন্ডরীকাক্ষ দেখলেন তাঁর রথটি মন দিয়ে একজন তরুণ পর্যবেক্ষণ করছে। অগ্নস ফিসফিস করে বললেন, 'এইই সেই।'

বৃহস্পতিও লক্ষ্য করেছিলেন ওদের দু-জনকে। তিনি গলা ছেড়ে বললেন, 'ভো ভো! মহাশয়কে তো আগে দেখি নি!'

পুন্ডরীকাক্ষ হাসিমুখে এগিয়ে এসে বললেন, 'মুনি-ঋষিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমার ভাল লাগে। আপনাকেও নতুন দেখছি।'

'লোহিতকেশি ব্যক্তিও আমি প্রথম দেখছি। আপনি কি অসুরবংশীয়?'

'আজ্ঞে না। আমি রাক্ষসবংশীয়।'

'উত্তম! রাক্ষসরা কি নাস্তিক? শুনেছি রাক্ষসদের মহান পূর্বপুরুষ রাবণ উত্তমরূপে বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন। অবশ্য বেদাধ্যয়ন করলেই যে আস্তিক হবে তার কোনও মানে নেই।'

'বেশ। এ নিয়ে একদিন তর্ক হতে পারে।'

বৃহস্পতি হাসলেন পুন্ডরীকাক্ষের কথায়। বললেন, 'আমার একটি সঙ্ঘ আছে। নাম চারুবাক্। কেউ কেউ বলে চার্বাক। একদিন আসবেন আমাদের সঙ্ঘে। আমরা বিশ্বাস করি মৃত্যুর পর আর কিছু থাকে না। জন্মান্তর অসম্ভব। জন্ম একটাই— কী বলেন?'

'ঠিক।' পুন্ডরীকাক্ষ সহসা আনমনা হয়ে গেলেন। 'যা করতে হবে এ জন্মেই করতে হবে হে নবীন বৃহস্পতি! আপনার বাক্য আমার মনে থাকবে।'

'জানতাম রাক্ষসরা নাস্তিক।'

অগ্নসের দিকে তাকিয়ে আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করলেন বৃহস্পতি। অগ্নস কিছু বললেন না। কথাটা তাঁরও মনে ধরেছিল।

ঝলমলে প্রভাতকাল। ঠান্ডা হাওয়া বইছে। পথঘাট এখনও ফাঁকা ফাঁকা। পুন্ডরীকাক্ষ রথ ছোটালেন। শক্তিমান ঘোড়া দুটি বায়ুবেগে তাঁকে নিয়ে চলল নয় সংখ্যক রাজপথের দিকে। পথের শেষে গঙ্গাঘাটে শ্মশান। তার আগে অরণ্যের গায়ে অগ্নসের গৃহ। অগ্নসও একজন সৈন্ধব। কিন্তু হস্তিনাপুরে সে আছে মুনির ছদ্মবেশে। বেদবিদ্যায় তাঁর খুব ভাল ধারণা। নির্জনে নিজের গৃহে সে বেদের নতুন ভাষ্য রচনা করছে বলে সবাই জানে। এর জন্য কুরুরাজের পক্ষ থেকে নিয়মিত দক্ষিণাও পেয়ে থাকেন।

১৪

গান্ধারী মাঝে মাঝে চোখে কালো কাপড় বেঁধে ঘুরে বেড়ান। এটা তাঁর প্রিয় অভ্যাস। এর ফলে শরীরের অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি বাড়ে। অন্তঃপুরে তিনি অনায়াসে চোখ বেঁধে ঘুরে বেড়াতে পারেন। দাসীরা একটু দূর থেকে তাঁর চলাফেরায় লক্ষ্য রাখলেও তাঁদের খুব একটা দরকার হয় না গান্ধারীর। আজকেও বিকেল বেলায় চোখে কাপড় বেঁধে গান্ধারী এদিক ওদিক ঘুরছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি টের পেলেন সামনেই বড়খোকার মহল। তারপরেই তাঁর মনে হল বড়খোকা সামনেই আছে।

সত্যি সত্যিই দুর্যোধন তখন নিজের মহল থেকে বেরিয়ে অপেক্ষমান রথের দিকে যাচ্ছিলেন। গান্ধারীকে তিনি লক্ষ্য করেন নি।

'বড়খোকা মনে হচ্ছে!' গান্ধারী চোখ থেকে কাপড় সরিয়ে তাকালেন। দুর্যোধন থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ মা। একটু বাইরে বের হচ্ছি।'

'গায়ে গরম কাপড় নেই কেন? দু-দিন হল রাতে বেশ ঠান্ডা পড়ছে।'

'তা পড়ছে।' দুর্যোধন শুকনো মুখে স্বীকার করলেন। তাঁর একটু তাড়া আছে। অঙ্গরাজ্য থেকে আজ কর্ণ এসেছে। তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছিলেন দুর্যোধন। তাঁর ইচ্ছাতেই ধৃতরাষ্ট্র কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের রাজা করেছেন ঠিকই, কিন্তু কর্ণকে তিনি খুব একটা পছন্দ করেন না। গান্ধারীও চান না যে ছেলে কর্ণের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করুক।

'তোর কী সব সংবাদ পাচ্ছি বড়খোকা?' গান্ধারী এগিয়ে এলেন। দুর্যোধন একটু থতমত খেয়ে বললেন, 'সংবাদ? আমি তো মৃগয়ায় যাব ভাবছি।'

'সে সংবাদ নয় বাছা! কার কার সঙ্গে মেলামেশা করছ আজকাল? আমি কিন্তু সব জানি!'

'কী জান মা?'

'লাল চুলের একটা লোকের সঙ্গে খুব ভাবসাব হয়েছে শুনলাম। তাঁকে নিজের মহলে নিয়ে এসে আপ্যায়ন করেছিস। সে কি কোনও রাজা?'

'ইয়ে— তুমি জানলে কী করে মা?'

'ভুলে যাস না বাছা আমি এ রাজ্যের মহারাণী। লাল চুলের লোকটা কে?'

'খুব গুণি লোক মা। মায়াবিদ্যা জানে।'

'সে জন্য কি তাঁকে নিজের মহলের ভেতরে নিয়ে এসে গল্প করতে হবে?'

'বাবা তো জানেন এ সব। তিনি তো কিছু বলেন নি!'

'তোমার বাবার তো ওই একটাই সমস্যা। তোমার স্নেহে তিনি অন্ধ।'

দুর্যোধন নতমুখে চুপ করে থাকল। মায়ের চোখে কিছু একটা আছে। সেদিকে এখন তাকান যাচ্ছে না।

'এখন যাচ্ছিস কোথায়?'

'এই একটু ঘুরে আসি।'

'কর্ণ এসেছে শুনলাম?'

'ক-কই না তো!'

'ভুলে যাচ্ছিস আমি মহারাণী। আমার কাছে সব সংবাদ থাকে।'

'ইয়ে— মানে— এসেছে।'

'বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ, যাও।' গান্ধারী স্বর গম্ভীর শোনাল। 'তবে কর্ণের সঙ্গে বেশি মাখামাখি না করাই ভাল। আর যদি শুনি তাঁকেও নিজের মহলে নিয়ে এসেছিস তবে এমন ঠ্যাঙাব—।'

'কর্ণ খুব ভাল ছেলে মা!' দুর্যোধন মরিয়া হয়ে গান্ধারীকে থামিয়ে দিয়ে বলে চললেন। 'ওর মত ধনুর্ধর আর একটা খুঁজে পাবে না তুমি। অর্জুনকে বলে বলে হারাবে। এই রকম গুণধর বন্ধু থাকা ভাগ্যের ব্যাপার।'

'চোপ!' এক ধমকে দুর্যোধনকে চুপ করিয়ে দিয়ে গান্ধারী আবার চোখে কাপড় বাঁধলেন। তারপর হন হন করে চলে গেলেন অন্যদিকে। দুর্যোধন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হাঁটা শুরু করতেই দেখলেন অদূরে একটা স্তম্ভের আড়াল থেকে দুঃশাসন উঁকি দিচ্ছে।

'তুই এখানে কী করছিস?' ভাই-এর ওপর রাগটা ঝেড়ে দিলেন দুর্যোধন। দুঃশাসন ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে হেসে বলল, 'কর্ণদা এসেছে বলিস নি তো! মৃগয়ায় কবে যাচ্ছিস? আমাদের নিয়ে যাবি না?'

দুর্যোধন আর দুঃশাসন ছাড়াও গান্ধারীর আটানব্বই জন দত্তক পুত্র আছে। দুঃশাসন হল

তাঁদের নেতা। একশ ভাই মাঝে মাঝে মৃগয়ায় বের হয়। সে এক ধুন্ধুমার ব্যাপার।

'মৃগয়ার পরিকল্পনা এখনও হয় নি। কর্ণ তো সবে এল। তবে তুই চাইলে এখন আমার সঙ্গে যেতে পারিস।' দুর্যোধন নরম গলায় বললেন। দুঃশাসন একটু বোকাসোকা ছেলে। পুন্ডরীকাক্ষর সঙ্গে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে, তা তাঁকে জানায় নি দুর্যোধন। দুঃশাসন মুখ ফস্কে সে সব কাউকে বলে ফেললে বাবার কানে সংবাদ পৌঁছতে দেরি হবে না এবং সে সংবাদ শোনার পর বাবা নির্ঘাত পুন্ডরীকাক্ষকে বন্দী করবে।

'লাল চুলের লোকটার সঙ্গে তোর কী এত মাখামাখি রে দাদা!' দুঃশাসন জিগ্যেস করে। 'লোকটার মধ্যে কী এমন খুঁজে পেলি?'

'জানতে চাস?'

'আমি কেন— হস্তিনাপুরের অনেকেই এ নিয়ে খুব চিন্তিত। সবাই জানে যে তোর সঙ্গে যদি কারোর মাখামাখির সম্পর্ক থাকে তবে সে হল কর্ণদা। একজন অচেনা ভিনদেশির সঙ্গে তোর এত ভাব কী করে হল বল তো?'

'তুই আমাকে বিশ্বাস করিস দুশু?'

'কী যে বলিস?' দুঃশাসনের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। আমরা নিরাব্বই জন ভাই তোর কথায় প্রাণ দিয়ে দিতে পারি।'

'নিরানব্বই না। সাতানব্বই।' দুর্যোধন একটু হেসে বললেন। 'যুযুৎসু আর জলসন্ধি আমাকে পছন্দ করে না। ওরা যুধিষ্ঠিরের ভক্ত। তা সে কথা থাক। লাল চুলের লোকটা আমাকে কী দিতে পারে সেটা তুই জানিস না দুশু। আমিও এখন সেটা বলব না। আমি যখন তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করছি, তখন ধরে নিতে পারিস কিছু একটা ব্যাপার আছে।'

'তা তো বটেই। তোর অপছন্দ হলে এতদিনে ওই লালচুলো নির্ঘাৎ হাড়গোড় ভেঙে চিকিৎসালয়ে ভর্তি হত। তা যখন হয় নি, তখন ধরেই নেওয়া যেতে পারে লোকটা কাজের!'

'কাজের নয়। খুব কাজের।'

আরও দু-চারটে কথার পর দুঃশাসন চলে গেল নিজের কাজে। দুর্যোধন নিশ্চিন্ত হয়ে রথে গিয়ে উঠলেন। সারথি জানত কোথায় যেতে হবে। কর্ণকে হস্তিনাপুরের রাজকীয় অংশে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। তিনি হস্তিনাপুর এলে সাত নম্বর রাজপথের একটি প্রাসাদে ওঠেন। দুর্যোধন সেখানেই যাবেন।

অগ্রহায়ণ মাস পড়ে গিয়েছে। নতুন বছরের শুরু। শীতের হাওয়া একটু একটু করে বইতে শুরু করেছে চারদিকে। আর কিছুদিনের মধ্যেই হাড় কাঁপান ঠান্ডা আর ঘন কুয়াশার দাপট শুরু হবে হস্তিনাপুরে।

রথ চলতে শুরু করল। দুর্যোধনের একটু শীত শীত করছিল। কিন্তু সে নিয়ে তিনি ভাবছিলেন না তখন। চলমান রথে বসে তিনি ভাবছিলেন আসন্ন আলোচনার কথা। কর্ণকে আসার জন্য তিনিই দূত পাঠিয়েছিলেন। পুন্ডরীকাক্ষের প্রস্তাব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য কর্ণই সব চাইতে উপযুক্ত। তাঁর সঙ্গে মন্ত্রণা না করা অবধি নিশ্চিত হতে পারছেন না দুর্যোধন। পুন্ডরীকাক্ষের প্রস্তাব যেমন অভিনব, তেমনই বিপদজনক। দুর্যোধন মনের গভীরতম প্রদেশে যে ভাবনাকে আশৈশব গোপন করে রেখে আসছিলেন, পুন্ডরীকাক্ষ তাকে জাগিয়ে তুলেছে।

কিন্তু তা কি আদৌ সম্ভব? তা কি অন্যায় নয়? ভবিষ্যতে কুরুরাজ্যের একছত্র অধীশ্বর হবে যুধিষ্ঠির। এটাই নিয়ম। এটাই সত্য। কিন্তু পুন্ডরীকাক্ষ বলছে অন্য কথা। সে অধীশ্বর হিসেবে ভাবছে দুর্যোধনকে। দরকার হলে পান্ডবদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে। যুদ্ধ হলে হস্তিনাপুরের মহারথিরা সকলে দুর্যোধনের পক্ষে থাকতে বাধ্য। কারণ তাঁরা সবাই কুরুবংশকে রক্ষা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধ মানে তো ভ্রাতৃযুদ্ধ! হস্তিনাপুরের ইতিহাসে এমন যুদ্ধ কখনও হয় নি। হবে বলেও ভাবে না কেউ। দুর্যোধন নিজেও ভাবেন নি এতদিন। কিন্তু এখন ভাবতে পারছেন। এই ভাবা কি অন্যায়?

দুর্যোধন এই প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর খুঁজছেন। কর্ণের মতামত তাই খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কর্ণ অপেক্ষা করছিলেন। পথশ্রমের ক্লান্তি থাকলেও দুর্যোধনের জন্য সেই ক্লান্তি তুচ্ছ। দুর্যোধন তাঁকে রাজা করেছেন। কর্ণ তাঁর জন্য জীবন বিসর্জন দিতে পারেন। প্রাসাদের সামনে দুর্যোধনের রথ থামতেই তিনি নিজে এগিয়ে এসে বন্ধুর হাত ধরে তাঁকে নামালেন। তারপর আলিঙ্গন পর্ব সেরে বললেন, 'এসো সখা। কী এমন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা— তা জানার জন্য আমি উদগ্রীব।'

'আমার আরও এক বন্ধু এই আলোচনায় যোগ দেবে কর্ণ।' একটু হেসে বললেন দুর্যোধন। 'তুমি তাঁকে চেন না। কিন্তু তাঁর গুরুর নাম হয় তো তুমি শুনে থাকবে।'

'শুনি সেই গুরুর নাম।'

'অম্লরাজ অঙ্গার।'

কর্ণ একটু চমকে উঠলেন। বললেন, 'তুমি কি সেই মহামায়াবী অম্লরাজের কথা বলছ বন্ধু?'

'ঠিক তাই।'

'এ যে অবিশ্বাস্য! অম্লরাজ কি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য তাঁর শিষ্যকে পাঠিয়েছেন?'

'ঠিক তাই।'

'কারণ?'

দুর্যোধন একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'আমি যদি এই রাজ্যের একছত্র অধীশ্বর হই তবে কি তা অন্যায় হবে?'

কর্ণ অবাক হয়ে দুর্যোধনের মুখের দিকে তাকালেন। না। দুর্যোধনের মুখে পরিহাসের কোনও চিহ্ন নেই। কর্ণ সেই মুখের দিকে তাকিয়ে কেটে কেটে বললেন, 'রাজা হওয়া ক্ষত্রিয়ের অধিকার। মহামান্য ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র তুমি। তোমার রাজা না হওয়ার কোনও কারণ নেই বন্ধু।'

'কিন্তু যুধিষ্ঠির?'

কর্ণ পিচ্ করে থুতু ফেললেন যুধিষ্ঠিরের নাম শুনে। গলার স্বরে তীব্র শ্লেষ মিশিয়ে বললেন, 'পান্ডবদের আমি ঘৃণা করি। যুধিষ্ঠিরের রাজা হওয়ার কোনও অধিকার নেই। তোমার আর ওর মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দেওয়ার প্রস্তাবেও আমার তীব্র আপত্তি বন্ধু। এতদিন বলার সুযোগ হয় নি— কিন্তু আজ বলছি, হস্তিনাপুরের সিংহাসনে কেবল তোমাকেই দেখতে চাই আমি। কারণ তুমি এই সুতপুত্রের গুণের মর্যাদা দিয়েছ! তুমি শুধু একবার ইচ্ছেটা প্রকাশ কর।'

দুর্যোধন প্রসন্ন হলেন। ঠিক এই কথাই তাঁকে বুঝিয়েছে পুন্ডরীকাক্ষ।

১৫

ভুসুকুর দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল। ভূতমিত্রের হাতি দেখাশোনার পাশাপাশি রকমারি মাছের ঝোল বানিয়ে ভীমকে পাঠাচ্ছিল সে। গঙ্গায় মাছের অভাব না থাকলেও ধরার লোকের বেশ অভাব। তাই ইচ্ছে থাকলেও নানা রকমের মাছ সংগ্রহ করতে পারছিল না ভুসুকু। অবশ্য হস্তিনাপুরে সরোবরের অভাব নেই। সেখানেও মাছ পাওয়া যায়। ভূতমিত্রের আশ্রমের পেছনে যে সরোবরটি রয়েছে, সেখানে মাছকে ঘাই মারতে দেখে ভুসুকু। সেখান থেকে মাছ ধরার জন্য সে ক-দিন ধরে জাল বোনায় মন দিয়েছে। কাজটা শেষ করতে সময় লাগবে, কিন্তু শেষ হলে ভীমসেনের জন্য মাছ পেতে সুবিধে হবে।

হস্তিনাপুরে এখন বেশ ঠান্ডা। এমন কনকনে ঠান্ডা ভুসুকু নিজের দেশে পায় নি। তার দেশেও জোর শীত পড়ে— কিন্তু সেই শীতের মধ্যে একটা ভেজা ভাব আছে। এদিককার শীতে সেটা নেই। হাত-পা শুকিয়ে যায়। চড়চড় করে। তবে শীতকাল জুড়ে হস্তিনাপুরে ফুর্তির হাট বসে। বড় বড় যজ্ঞ হয়। ঠান্ডার মধ্যে যজ্ঞের আগুন বেশ আরাম দেয় বলে এই সময় যজ্ঞের আয়োজন বেশি। সে কারণে নানা দেশ থেকে মুনি-ঋষিরা এসে ভিড় জমায় হস্তিনাপুরে।

ভূতমিত্রের আশ্রমেও বার্ষিক মহাযজ্ঞ হবে। সে নিয়ে আশ্রমিকদের মনে উত্তেজনার শেষ নেই। ভুসুকু রোদ্দুরে বসে জাল বুনতে বুনতে সেই উত্তেজনা লক্ষ্য করছিল। যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে এর মধ্যে আর কোনও সংবাদ আসে নি। ভুসুকু আশ্রমের বাইরে বের হলে অবশ্য দু-জন নিরাপত্তা রক্ষীকে দেখতে পায়। একটু দূর থেকে তাঁরা লক্ষ্য রাখে ভুসুকুর ওপর। তবে গন্ডগোল কিছু ঘটে না। লালচুলের ধূর্জটিবর্মার সঙ্গে ভুসুকুর আর দেখা হয় নি। তবে নগরে আলোচনা থেকে সে জেনেছে দুর্যোধনের একটি নতুন বন্ধু জুটেছে। তাঁর চুলের রঙ লাল। এই বন্ধুত্ব নিয়ে নাগরিকদের মনে বেশ কৌতূহল। কারণ দুর্যোধন কোনও সাধারণ লোকের সঙ্গে মেশেন না। তাঁর বন্ধু বলতে কেবল অঙ্গরাজ্যের রাজা কর্ণ। কর্ণ অবশ্য একজন উঁচু দরের যোদ্ধা। ধনুর্বিদ্যায় সে বড় না অর্জুন বড়— তা নিয়ে নানা লোকের নানা মত। তাই কেউ কেউ ধরে নিয়েছে যে লালচুলের লোকটাও নিশ্চই একজন মহাবীর। নইলে দুর্যোধনের সঙ্গে তাঁর অত সখ্য কেন?

জাল বুনতে বুনতে ভুসুকু দেখল মধুক্ষরা তাঁর দিকে হাসিমুখে এগিয়ে আসছে। মধুক্ষরা মাঝে মাঝেই আশ্রমে আসে। তাঁর গানের গলা ভারি মিষ্টি। বীণার সুরে সুর মিলিয়ে চমৎকার বেদগান গাইতে পারে সে। ভূতমিত্র এই কারণে তাঁকে বেশ স্নেহ করেন। মধুক্ষরাকে দেখলে ভুসুকুরও ভারি ভাল লাগে। মধুক্ষরাও আশ্রমে এলে ভুসুকুর সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করে যায়। মনে হয়ে যেন ভুসুকুর সঙ্গে গল্প করায় তাঁরও বেশ আগ্রহ আছে।

'কী সংবাদ মধুক্ষরা?' ভুসুকু জাল বোনা থামিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'বেশ কয়েকদিন পর এলে মনে হচ্ছে?'

'বাজে কথা বলো না তো!' মধুক্ষরা কপট রাগের সুরে বলল। 'কাল এসেছিলাম। পরশুও এসেছিলাম। তুমিই তো হাতি নিয়ে কোথায় জানি গেছিলে!'

'যজ্ঞের কাঠ আনতে গেছিলাম। দুর্বাসা মুনির খবর কী?'

'তিনি এখন যুধিষ্ঠিরের অতিথি হয়েছেন।' মধুক্ষরা ঘাসের ওপর বসল। ভুসুকু তাঁর মুখোমুখি বসে বলল, 'এটা কী বলো তো?'

'জানি। মাছ ধরার জাল বুনছ তুমি। এটা আর কত বড় হবে?'

'ইচ্ছে করলে অনেক বড় করা যায়। তবে এটা বেশি বড় হবে না। এদিকে জাল বোনার সুতো পাওয়া যায় না। এই সুতো আমি দেশ থেকে নিয়ে এসেছিলাম। সুতো প্রায় শেষ।'

মধুক্ষরা অন্যমনস্কের মত ভাঁজ করে রাখা জালটা নাড়াচাড়া করতে লাগল।

'তুমি জাল বোনা শিখবে?'

মধুক্ষরা হঠাৎ চোখ তুলে জিগ্যেস করল, 'তুমি এখানে কতদিন থাকবে?'

'মানে?'

'অসুররা তো কেউ এদেশে স্থায়িভাবে থাকতে আসে না। কাজে আসে। কাজ হলে ফিরে যায়। তুমিও নিশ্চয়ই কাজ শেষ হয়ে গেলে ফিরে যাবে নিজের দেশে? আর তোমার দেশ তো অনেক দূরে।'

ভুসুকু হাসল। বলল, 'আমি ঠিক নির্দিষ্ট কোনও কাজ নিয়ে আসি নি। তবে ভীমসেনের সঙ্গে দেখা করার একটা ইচ্ছে আছে। সেটা না হওয়া পর্যন্ত হস্তিনাপুর ছাড়ছি না।'

'এটা কোনও সমস্যা?' মধুক্ষরা বেশ অবাক হয়। 'তুমি তো চাইলেই ভীমসেনের সঙ্গে দেখা করতে পারো। তুমি তো তাঁর জন্য মাছ রান্না করে পাঠাও।'

'গোপন ব্যাপার। আমি ছাড়া কেবল তোমরা জান। এর বাইরে ভূতমিত্র ছাড়া এ সংবাদ আর কেউ জানে না। অবশ্য ভীমসেনের হয়ে যেই লোকটি নিয়মিত মাছ নিয়ে যায়, সে জানে।'

'তাঁর মাধ্যমেই তো তুমি ভীমসেনের কাছে সাক্ষাতের বার্তা পাঠাতে পারো?'

'না। পারি না।'

'কেন পারো না?'

ভুসুকু চুপ করে থাকল একটু ক্ষণ। তারপর ধীর গলায় বলল, 'অনেক কথা মধুক্ষরা। আমি তোমাকে বলতে পারি। কিন্তু তুমি আগে প্রতিজ্ঞা কর কাউকে বলবে না।'

'তুমি কি কিছু গোপন করছ ভুসুকু?'

মধুক্ষরার মুখে নিজের নামটা মধুর মত শোনাল ভুসুকুর কানে। মধুক্ষরা তাঁর দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। তাঁর চোখ দুটি ভারি সুন্দর। ভুসুকু সেদিকে তাকিয়ে থাকল।

'আমাকে বলতে পারো।' আচমক ভুসুকুর হাতে হাত রেখে বলে উঠল মধুক্ষরা। তারপর লজ্জা পেয়ে হাত সরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে বলল, 'থাক। দরকার নেই। আমি যদি কাউকে বলে দিই।'

'আমি জানি তুমি বলবে না।'

মধুক্ষরার মুখে আবার হাসি ফিরে এল। সে ভুসুকুর দিকে মুখ ফিরিয়ে সহজ গলায় বলল, 'তাহলে বলো।'

ভুসুকু বলল। সব খুলে বলল। শুনতে শুনতে মধুক্ষরার হাঁ হয়ে গেল। সব কথা শোনা হলে সে উত্তেজনায় আবার ভুসুকুর হাত চেপে ধরে বলল, 'কী ভয়ানক! তুমি বলছ লালচুলো লোকটা কুরু-পান্ডবের মধ্যে বিভাজন ঘটাতে চায়? যুধিষ্ঠির তোমাকে সব কিছু গোপন রাখতে বলেছেন? কিন্তু তোমাকে ওরা আটকে রেখেছিল কেন? উঃ! তুমি তো সাঙ্ঘাতিক লোক! কী ভাবে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছ!'

'আমি জানি না ওরা কেন আমাকে বন্দি করেছিল। কিন্তু যাই হোক না কেন, যুধিষ্ঠিরের নির্দেশ না পাওয়া অবধি আমি ভীমসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব না বলে ঠিক করেছি।'

'আর যুধিষ্ঠির যদি নির্দেশ না পাঠান?'

'তা হয়ত হবে না।' অন্যমনস্কের সুরে বলল ভুসুকু। 'সময় হলে তিনি ঠিকই নির্দেশ পাঠাবেন।'

'সেটা না হলেই ভালো।'

মধুক্ষরার কথা শুনে ভুসুকু এবার একটু অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'কেন বলো তো?'

মধুক্ষরা উঠে দাঁড়াল। তারপর ভুসুকুর চোখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে শান্ত গলায় বলল, 'ভীমসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই তো তুমি ফিরে যাবে, তাই না? আমি সেটা চাই না।'

ভুসুকু বলল। সব খুলে বলল। শুনতে শুনতে মধুক্ষরার হাঁ হয়ে গেল। সব কথা শোনা হলে সে উত্তেজনায় আবার ভুসুকুর হাত চেপে ধরে বলল, 'কী ভয়ানক! তুমি বলছ লালচুলো লোকটা কুরু-পান্ডবের মধ্যে বিভাজন ঘটাতে চায়? যুধিষ্ঠির তোমাকে সব কিছু গোপন রাখতে বলেছেন? কিন্তু তোমাকে ওরা আটকে রেখেছিল কেন? উঃ! তুমি তো সাঙ্ঘাতিক লোক! কী ভাবে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছ!'

ভুসুকু মুহূর্তের জন্য বাক্যহারা হল। তারপর সে কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু মধুক্ষরা ততক্ষণে দৌড় দিয়েছে। ছুটন্ত মধুক্ষরাকে দেখতে দেখতে ভুসুকুর মন হঠাৎ ভরে উঠল অচেনা আনন্দে। তাঁর মনে হল মধুক্ষরা যেন একটা প্রজাপতি। হাওয়ার মধ্য দিয়ে ফুরফুর করে উড়ে যাচ্ছে। আর যেতে যেতে যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে রঙ। তাঁর নূপুরের ছম ছম শব্দ যেন স্পষ্ট শুনতে পারছে ভুসুকু। সেই নিক্বণ যেন বীণার সুরের মত ছড়িয়ে পড়ছে আশ্রমের বাতাসে বাতাসে, হাওয়ায় হাওয়ায়, পাতায় পাতায়, ডালে ডালে।

ভুসুকু কতক্ষণ সেই নিক্বণ মনে মনে শুনছিল তা জানে না। তাঁর ঘোর কাটল এক আশ্রমিকের চিৎকারে। ছেলেটি দূর থেকে চিৎকার করে ভুসুকুকে ডাকছিল। ভুসুকু তাঁর দিকে তাকাতেই সে উত্তেজিত গলায় বলল, 'শীঘ্র আসুন! কামরূপের রাজদূত এসেছেন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে!'

এবার ভুসুকুর ছোটার পালা।

১৬

ভীষ্ম তাঁর সামনে রাখা ঢালটি পরীক্ষা করার পর অস্ত্র ব্যবসায়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'এবার বলুন, আপনার তৈরি এই ঢালের বিশেষত্ব কী?'

'আজ্ঞে এর নাম সপ্তপ্রলেপ ঢাল।'

'নামে কী আসে যায়? ঢালের নাম অলম্বুষ হলেও ক্ষতি নেই যদি সেটা ঢালের মত ঢাল হয়।'

'আজ্ঞে এই ঢাল অদ্বিতীয়। এতে সাতটা স্তর আছে। একেবারে নিচের তিনটি স্তর তো অভেদ্য।'

'কর্ণের তির আটকাতে পারবে?'

'কর্ণ?'

'কর্ণকে চেনেন না?'

'চিনব না কেন? তবে তিনি কি খুব ভাল তিরন্দাজ?'

'খুবই ভাল। তাঁর তির আপনার ঢালের প্রলেপ ভেদ করতে পারবে বলে মনে হয়?'

'আজ্ঞে— মানে— কর্ণের তিরনিক্ষেপণ কৌশল না দেখে বলি কী ভাবে?'

'তবে দেখে এসে জানিয়ে যাবেন। আমার তো মনে হচ্ছে এই ঢাল কাঠঠোকরা ঠোক্কর দিলেই ফুটো হয়ে যাবে। তা-ও যখন সুদূর কাঞ্চিদেশ থেকে এসেছেন, তখন একটু জেনেই নিন। কর্ণ এখন হস্তিনাপুরেই আছে।'

ভীষ্ম উঠলেন। পেছনে অপেক্ষমান সেনাপতিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাদের স্বদেশি অস্ত্র নির্মাণের সংবাদ কেমন? কিছু ফল পেলেন?'

'অসুরদের তত্ত্বাবধানে অভূতপূর্ব উন্নতি হচ্ছে। আমরা মরচেবিহীন তিরের ফলা বানিয়ে ফেলেছি।' বিয়াল্লিশ সংখ্যক সেনাশিবিরের উপপ্রধান মিহি গলায় জানালেন। 'একটি মাত্র সমস্যা দূর হলেই সেই ফলা আমরা তিরন্দাজ বাহিনীকে ব্যবহারের অনুমতি দেব।'

'সমস্যাটা কী?'

'ফলাগুলি একটু ভোঁতা হয়েছে— মানে, চোখা করতে গেলে ভেঙে যাচ্ছে। সামান্য সমস্যা।'

ভীষ্ম মনে মনে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এভাবে চললে আগামি অর্থবর্ষে স্বদেশি অস্ত্র গবেষণায় বরাদ্দ কমিয়ে দিতে বাধ্য হব। বিপুল ব্যয় করে আপনারা যে আগ্নেয়াস্ত্রগুলো বানিয়েছিলেন, একটি বর্বর দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের ভ্রাম্যমান সেনাবাহিনী তা ব্যবহার করেছিল। একটা ঘাসও পোড়ে নি।'

'আজ্ঞে আকাশ মেঘলা থাকায় সেটা ঘটেছিল। আমরা তদন্ত করে জেনেছি। রোদ্দুর থাকলে— ।'

'যুদ্ধ না করে আপনারা দর্শনচর্চা করলে হস্তিনাপুর উপকৃত হত। এরপর বলবেন অমাবস্যা-পূর্ণিমায় আপনাদের তৈরি তিরের ফলা ভোঁতা হয়ে যায়। —যাক গে! এই ঢালগুলো কর্ণের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।'

ভীষ্ম গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। সেনাপতিরা নিজেদের মধ্যে একটু গুজগুজ ফিসফাস করে দাঁড়িয়ে থাকা অস্ত্র ব্যবসায়ীকে জিগ্যেস করলেন, 'কী হে? তোমার নাম কী?'

'আজ্ঞে শল্যবান।'

পদাতিক বাহিনীর একশত আঠার সংখ্যক শিবিরের অধ্যক্ষ আদেশ দিলেন, 'ঢালগুলো নিয়ে বাইরে যাও। আমি একটি রথের ব্যবস্থা করছি। তবে গিয়ে খুব একটা লাভ হবে না। ঢালগুলো দেখে মনে হচ্ছে মাটির চাকা। ঢাল বটে বানিয়েছি আমরা। একশ শতাংশ অভেদ্য। শুধু একটি সমস্যা থেকে গেছে।'

শল্যবান নিরীহ মুখে জিগ্যেস করল, 'খুব ছোট সমস্যা?'

'খুবই ছোট। ক্ষুদ্রও বলা চলে। ভারের কারণে সেগুলি বহন করতে হাতির দরকার হচ্ছে।'

শল্যবান আরো নিরীহ মুখে জিগ্যেস করল, 'অথচ যুদ্ধ তো মানুষ করবে, তাই নয় কি?'

'ঠিক তাই। একটি ঢাল তুলতে তিনজন লাগছে। বড় সমস্যা আদৌ নয়।'

'তিনজন সেনা একটি ঢাল বহন করে যুদ্ধ করবেন— এমনটা কি শাস্ত্রসম্মত?'

'তিনজনের জায়গায় একজন করতে হবে। এইজন্যই তো বলছি, সমস্যাটা খুবই সামান্য। তবে সেটা যতদিন না পারছি ততদিন ঢাল আমাদের আমদানি করতেই হবে। ঢাল ছাড়া তো যুদ্ধ হয় না!'

শল্যবান মনে মনে হাসলেন। খানিক পরে তিনি ঢালগুলো নিয়ে রথে উঠে যাত্রা করলেন কর্ণের আবাসে। কর্ণের বিষয় তাঁর তেমন ধারণা নেই। লোকমুখে শুনেছেন তাঁকে হস্তিনাপুরের রাজকীয় অংশে থাকার অনুমতি দেওয়া হয় নি। দুর্যোধনের ইচ্ছাতেই কর্ণ রাজা হয়েছেন। অন্যথায় তিনি নাকি সুতপুত্র। রাজা হওয়ার কোনও কথাই ছিল না তাঁর। কিন্তু স্বয়ং ভীষ্ম যখন বললেন, তখন মানতেই হবে তিনি উঁচু মানের তিরন্দাজ। কতটা উঁচু সেটা অবশ্য বলেন নি। হস্তিনাপুর এমন একটা নগর যেখানে দেশের সেরা তিরন্দাজেরা বাস করে। তাঁদের মধ্যে অন্তত একশ জন উঁচু মাপের তিরন্দাজ পাওয়া যাবে।

কর্ণের প্রাসাদটি খুব একটা রাজকীয় মনে হল না শল্যবানের। কর্ণ একটি সুসজ্জিত কক্ষে বসে সোমরস পান করছিলেন। তাঁর চোখ দুটি লাল। শরীর সুগঠিত হলেও তাঁর মধ্যে কোনও বিশেষত্ব খুঁজে পেলেন না শল্যবান। অস্ত্র বিক্রি করতে গিয়ে রাজা আর বীর তিনি কম দেখেন নি। কর্ণ নিশ্চই তাঁদের তুলনায় অতিরিক্ত কিছু নয়।

'পিতামহকে কেমন দেখলেন?' ঢালগুলির দিকে না তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন কর্ণ।

'তিনি সর্বদা সুস্থ এবং পরাক্রান্ত। তিনি আপনাকে উঁচু মানের তিরন্দাজ বলে স্বীকার করেন।'

'সেটা তাঁর মহত্ব। তিনি যখন ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন তখন আপনার ঢাল আমি পরীক্ষা করে দেখছি।' কর্ণ সোজা হয়ে বসলেন। তিনি তুড়ি বাজাতেই একজন দাস ঘরে প্রবেশ করে প্রণাম জানাল।

'কালো রঙের ছোট ধনুকটা নিয়ে আয় তো। সঙ্গে কয়েকটা তির আনিস।'

দাস দৌড়ল। কর্ণের অনুমতি নিয়ে শল্যবান একটি আসনে বসলেন। একটি ঢাল কর্ণের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এর নাম সপ্তপ্রলেপ। সাতটা স্তর রয়েছে পর পর।'

কর্ণ একবার তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে ঢালটা এক পলক দেখলেন। মনে হল সেটা যেন ঢালই নয়। সত্যিই যেন মাটির চাকা। একটু পরে দাস যে ধনুকটা নিয়ে ঢুকলেন সেটা দেখে শল্যবান নিশ্চিত হলেন যে তাঁর ঢাল পরীক্ষায় ভালভাবেই পাশ করবে। অমন বাচ্চাদের ধনুক দিয়ে কত জোরে আর তির নিক্ষেপ করা সম্ভব?

'ঢালটা নিয়ে ওই স্তম্ভটার কাছে দাঁড়া!'

কর্ণের আদেশ মেনে দাস ঢালটা নিয়ে কুড়ি হাত দূরে একটা স্তম্ভের পাশে দাঁড়াল। কর্ণ বসে থাকা অবস্থায় ধনুকটা এক হাতে নিয়ে অপর হাতে দুটো তির তুলে নিলেন।

'ঢালটা ওপরে ছুঁড়বি। এক, দুই—।'

দাস ঢালটা স্তম্ভ বরাবর ওপর দিকে ছুঁড়ে দিতেই দুটো তির একসঙ্গে বিদ্যুতের মত ছিটকে বের হল কর্ণের ধনুক থেকে। ঢালটাকে স্তম্ভের সঙ্গে গেঁথে ফেলে তির তির করে কাঁপতে থাকল তির দুটি।

শল্যবান বিড়বিড় করে বললেন, 'অবিশ্বাস্য!'

কর্ণ ধনুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গা এলিয়ে দিয়ে প্রশংসার সুরে বললেন, 'ঢালটা মন্দ নয়। আমি তো ভেবেছিলাম দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে।'

শল্যবান মুগ্ধ চিত্তে কর্ণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন, 'এই তিরনিক্ষেপ অবিশ্বাস্য! আমাকে ক্ষমা করুন।'

'আপনার কি মনে হয়েছিল আমি তির ছুঁড়তে পারি না?'

শল্যবান উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বললেন, 'ক্ষমা করবেন। আমি ভেবেছিলাম অর্জুন আর ভীষ্মের মত অতি অল্প কয়েকজন ধনুর্ধর ব্যতীত এই ঢাল কেউ ভেদ করতে পারবে না।'

কর্ণ হাসলেন। হাসিটা এতটাই ক্রূর যে শল্যবানের অস্বস্তি হল।

'পিতামহের কথা আলাদা। আর, মধ্যম পান্ডবকে আপনারা মহান তিরন্দাজ ভাবতে পারেন, কিন্তু আমি তাঁকে গুরুত্বই দিই না।' কর্ণ তৃতীয় তিরটি ধনুকে যোজনা করে তাক করলেন শল্যবানের দিকে। শল্যবান কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন।

'আ-আমার দিকে তাক করছেন কেন? আমি তো ক্ষমাপ্রার্থী!'

'চোখ বন্ধ করুন।'

কর্ণের শীতল গলা শুনে শল্যবানের শরীর হিম হয়ে যেতে লাগল। তিনি চোখ বন্ধ করে প্রিয়জনের মুখ স্মরণ করতে লাগলেন। কর্ণ কি তাঁকে হত্যা করবেন না আহত করবেন?

ছিলার শব্দটা শুনলেন শল্যবান। না। কোনও যন্ত্রণা টের পেলেন না তো! তাহলে কি তিনি মরে গেলেন? মাথাটা হালকা হালকা ঠেকছে যেন! মরে গেলে মানুষ ভারমুক্ত হয় বলে শুনেছেন তিনি।

তখনই কর্ণের অট্টহাস্য তাঁকে চমকে দিল। সাহস করে চোখ খুলে দেখলেন প্রবল হাস্যে কর্ণ ফেটে পড়েছেন। শল্যবান ভয়ে ভয়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখলেন পাগড়িটা নেই। একরাশ বিস্ময় নিয়ে পেছনে তাকিয়ে আবিষ্কার করলেন সেটা স্তম্ভে আটকে থাকা ঢালের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে। কর্ণের ছোঁড়া তিন নম্বর তিরটা তাঁর মাথা থেকে পাগড়িটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেঁথে ফেলেছে ঢালটার সঙ্গে।

'যান। পিতামহকে গিয়ে বলুন যে ঢাল আমার ভাল লেগেছে। আর অর্জুনকে গিয়ে বলুন কী ভাবে ঢালের পরীক্ষা করেছি আমি।'

শল্যবান আরেকবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলেন। সংবাদ তিনি পৌঁছে দিলেন ভীষ্মের কাছে। ভীষ্ম সেই সংবাদ শুনে কিছুক্ষণ মৌন হয়ে তাকিয়ে থাকলেন বাতায়নের ওপারে একটি মাদার গাছের দিকে।

ঢাল তাঁর আগেই পছন্দ হয়েছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মুষ্ঠিমেয় কয়েকজন তিরন্দাজ ছাড়া এই ঢাল ভেদ করা কঠিন। তিনি কেবল দেখতে চেয়েছিলেন কর্ণ এই ঢাল ভেদ করতে পারে কি না। কর্ণ তা পেরেছে। সে অবলীলায় পেরেছে বললে ভুল হবে, খেলাচ্ছলে ভেদ করেছে এই ঢাল। এই সংবাদ অর্জুনের পক্ষে ভাল হবে না।

সন্ধে হয়ে এসেছে। হালকা হাওয়া বইছে নগর জুড়ে। সে হাওয়া তিরের ফলার মতই তীক্ষ্ণ। কক্ষের প্রদীপগুলি জ্বালিয়ে দিচ্ছিল একজন। প্রদীপের শিখাগুলি কাঁপছিল হিমশীতল বাতাসে। তেমনই একটি শিখার দিকে তাকিয়ে ভীষ্ম একটি অঙ্ক কষতে লাগলেন মনে মনে। যুধিষ্ঠির তাঁকে সম্প্রতি এক অবিশ্বাস্য সংবাদ দিয়েছে। একজন লালচুলের মানুষ চাইছে কুরুবংশে বিভাজন ঘটাতে। সে দুর্যোধনের পরম মিত্র। যদি সত্যিই কোনওদিন অর্জুন আর কর্ণ পরস্পরের মুখোমুখি হয় তবে ফলাফল কী হতে পারে? যদিও তেমন ঘটনা ঘটার কোনও সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। হস্তিনাপুরের ইতিহাসে সিংহাসন নিয়ে ভ্রাতৃযুদ্ধ কখনও হয় নি। যুধিষ্ঠিরকে রাজা বলে মেনে নিতে দুর্যোধন কোনও আপত্তি জানায় নি অদ্যাবধি। প্রয়োজনে সাম্রাজ্য ভাগ করে দু-জনকে বন্টন করার ভাবনাও স্থির করে রেখেছেন ভীষ্ম।

তবুও লালচুলের অভিপ্রায় জেনে তাঁর দুশ্চিন্তা হচ্ছে। এই ব্যক্তিটির বিষয়ে তাঁকে ভাবতে হবে। কে সে? ভুসুকু নামক ব্যক্তিকে সে যা বলেছে তা কি সে সত্যই কামনা করে? নাকি সে বায়ুগ্রস্ত? বায়ুগ্রস্ত হলে দুর্যোধন কি তাঁকে গ্রহণ করত? কর্ণও বা হস্তিনাপুর ছুটে এসেছে কেন?

প্রদীপের শিখা কাঁপতে থাকে। ভীষ্মের অঙ্ক মেলে না। এক সময় তিনি কক্ষ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর মহলের তিন দিক জুড়ে নয়নাভিরাম উদ্যান। ভীষ্ম উদ্যানে হাঁটতে লাগলেন।

'দেবতাদের সাহায্য প্রয়োজন।'

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে আপন মনে উচ্চারণ করলেন কথাটা।

দেবতারা বহুযুগ হল আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। কেবল কয়েকজন দেবদূত হস্তিনাপুরের উত্তরে গভীর অরণ্যময় পর্বতে একটি বিশেষ অট্টালিকা নির্মাণ করে বসবাস করছেন। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। ভীষ্ম মাত্র একবার সেখানে গিয়েছিলেন অনেক বছর আগে। সে এক আশ্চর্য অট্টালিকা। কক্ষের দেয়ালে টাঙান থাকে মায়ামুকুর। সেই আয়নায় হস্তিনাপুরের সব কিছু দেখতে পান দেবদূতেরা। তাঁদের কানে ঝোলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূষণ। সেই কর্ণভূষণের মাধ্যমে তাঁরা একে অপরের কথা বহু দূর থেকে শুনতে পান। তাঁদের অট্টালিকার প্রাকারের ফাঁক দিয়ে এক ধরনের নল বেরিয়ে থাকে। তা থেকে নিক্ষিপ্ত হয় বিধ্বংসী গোলক। যেন ব্রহ্মাস্ত্র। সহস্র বজ্রপাতের মত শব্দে সে গোলক পলকের মধ্যে লয় করে দেয় একটি প্রাসাদ।

অবশ্য সেই গোলক নিক্ষেপণ ভীষ্ম দেখেন নি। কিন্তু জানেন। বহু কাল আগে একবার সেই নল থেকে গোলা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল পাহাড়ের গায়ে। একটি ছোট চূড়া পরিণত হয়েছিল সমতলে। সেই স্থানের নাম সমশীর্ষ। আসলে অট্টালিকা স্থাপনের জন্যই পাহাড় ভাঙতে হয়েছিল তাঁদের।

সমশীর্ষে গিয়ে দেবদূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ব্যাপারটা ভাবার পর ভীষ্মের মনটা হালকা হল। তিনি ঠিক করলেন যে আগামী সকালে তাঁর প্রথম কাজ হবে সমশীর্ষে বার্তা পাঠান। এর জন্য একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পারাবত আছে। বার্তা লিখে তার পায়ে বেঁধে উড়িয়ে দিলেই সে পৌঁছে যাবে দেবদূতাবাসে।

(ক্রমশ)

মরা মৌমাছির চোখ

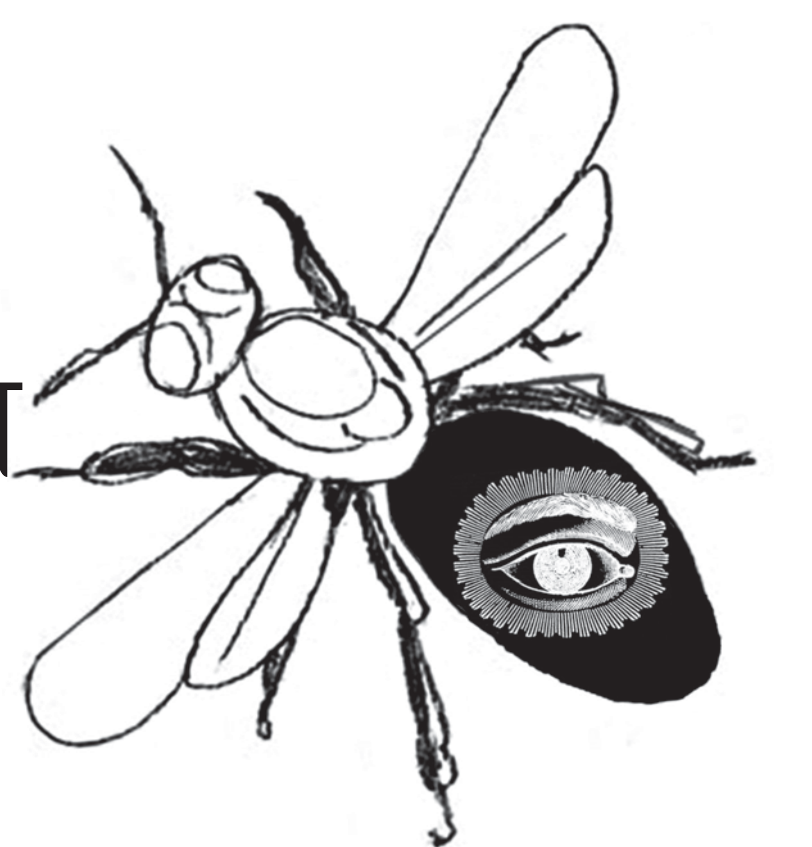

সাগরিকা রায়

"উচাটন হয়ে আছি। এস। ক্যাফে ডি-তে।" খবরের কাগজের ছোট্ট বিজ্ঞাপন কী বলে? শুভব্রতর মৃত্যু নিয়ে কোন ভাবনায় ডুবে যাচ্ছে কৃপাসিন্ধু? জবালা মর্মান্তিক আহত কি মানসিকভাবে? নাকি শরীরের ক্ষতে বিভ্রান্ত? শুভদীপের পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট কী বলছে?

১৮

চেহারাটা যাকে বলে সুন্দরী সমাজে অচল! শরীরের মেদহীনতা যদি সৌন্দর্যের পরিচায়ক হয়, তাহলে তাকে সুন্দর বলা যাবে এতে সন্দেহ নেই। ছ'ফিট দেড় ইঞ্চির মানুষটি টান শরীরে দৃপ্ত। কোনও কালে রং মাজা থাকলেও এখন তামাটে বললে অত্যুক্তি হয় না। এমন বয়স নয় যে বিয়ে করা যাবে না। অথচ যার জন্য এত কথা, তার আজ অবধি বিয়েতে রুচি হল না। মাসিমা শ্রেণির উদাস গলা প্রায়ই শোনা যায়, "আহা! এ বয়েসে এমন বিবাগি হলি? বিয়ে কর। দেখে চক্ষু সার্থক করি।" বললে সে হাসে। হাসতে হাসতে সুন্দর করে বলে, "তোমরা না হয় চক্ষু সার্থক করলে, কিন্তু যাকে বিয়ে করব, সে যে গান্ধারীর মত চক্ষু বুজেই দিন কাটাবে!"

মাসিমারা জবাবে কী বলা যায় ভাবতে ভাবতেই সে ততক্ষণে সখের লাইব্রেরির অতি গূঢ় কোনও বইয়ের ততোধিক গূঢ় পৃষ্ঠায় মন দিয়েছে। বিয়ে হল না বা হলে নূপুর পায়ে কোনও ছলনাময়ী তার চারপাশে ঘুরঘুর করলে কেমন হত, এসব তার মস্তিষ্কে কতটা ঢোকে কে জানে! বাপ যা রেখে গেছেন, তাতে পায়ের ওপর পা রেখে নিজের জীবনটা আয়েশ করে কাটিয়ে দেওয়া যেতই। তা সত্ত্বেও একটি চাকরি সে করে। পুলিশ ডিপার্টমেন্টে।

সুতরাং ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মত বুদ্ধি তার যথেষ্ট আছে। সে সব খেয়াল মিটিয়ে নিতে ব্যস্তও থাকে। এসবের মধ্যে বিবাহ শব্দের প্রয়োজন অনুভব করে বলে মনে হয় না। সহকর্মী অলক দত্ত তাকে এ বিষয়ে একবার প্রশ্ন করেছিল। তার উত্তরে কৃপাসিন্ধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিল দত্তর দিকে, "হঠাৎ তুমি বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে? হুম, পারফিউম ইউজ করছ! শ্যাম্পু করেছ আজ? তোমার সেই ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল তেলের কী হল দত্ত?"

কৃপাসিন্ধুর দৃষ্টির সামনে সঙ্কুচিত দত্ত, "মানে স্যার...!"

"মানে বুঝেছি। গার্ল ফ্রেন্ড জুটেছে। ফেবু ফ্রেন্ড হলে দেখেশুনে দত্ত। যা সব শুনছি! কয়েকটা কেস তো দেখলাম। আচ্ছা, পুলিশের সঙ্গে কেউ প্রেম করে? আশ্চর্য করলে!"

"না স্যার। সেসব নয়। আজ আমাদের বাড়িতে কারা আসবেন। সম্বন্ধের ব্যাপার। কিন্তু স্যার অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ হোক বা লাভ, ব্যাপার তো সেই সংসার তৈরি। অসুবিধে কী?"

"বল কী? পুলিশের কি এত সাহস হয়? একজন মহিলার সঙ্গে ভাব জমিয়ে তাকে ছাদনাতলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া...! এর চে রঘুডাকাতের মোকাবিলা করা সহজ!"

"আপনি মহিলাদের ভয় পান স্যার?"

"তা একটু পাই।"

"কেন? মহিলারা তো মানুষই। মানে মানুষী।"

"হ্যাঁ। তা বলতেই হবে। খোক্কসী বা রাক্ষসী তুমি বলতে পার না। আসলে এই বিষয়টা নিয়ে আমি সেভাবে ভাবিনি কখনও। তবে একেবারেই ভাবিনি, তা নয়। বিবাহিত পুরুষকে দায়িত্বভার সঁপে দিয়ে সংসার নামক চিড়িয়াখানার কর্তাব্যক্তি বানিয়ে তার ধারালো দিকটাকে ভোঁতা করে দেওয়া হয়! ডায়মন্ড কাটের বুদ্ধির ঝিলিক খুব কম বিবাহিতের মধ্যে দেখা যায়। অবশ্য আমার দেখাশোনা খুব কম। কলেজ লাইফে যে বন্ধুটির জোরালো বক্তব্য কান পেতে শুনতাম, বিয়ের পর যখন তার স্ত্রী-কিসে যাবে? ট্যাক্সিতে? না বাস-এ? এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, ওহ, তখন তার কিংকর্তব্যবিমূঢ় চেহারাটা যদি দেখতে! কী করলে বউ খুশি হবে? বাসে গেলে? না কি ট্যাক্সিতে? এই প্রশ্নই তার কাছে মুখ্য তখন। পৌরুষের সবটুকু বউয়ের লাল হ্যান্ড ব্যাগে ঢুকেছে।"

দত্ত এরপর কিছু বলেছে কিনা সেটা এহ বাহ্য। ইদানিং কৃপাসিন্ধুর দিনগুলো বড্ড পানসে হয়ে গেছে। খবর নেই। খবরের কাগজ খুঁটে দেখে। কোথাও কি খবর নেই? সেবারে একটা বিজ্ঞাপন দেখে কৌতূহল হয়েছিল। অদ্ভুত বিজ্ঞাপন। "এস, উচাটন হয়ে আছি। দেখা করতে চাই। ক্যাফেতে সন্ধে ছ'টা। ডি লুনা।" অর্থাৎ, এস নামের কাউকে লুনা নামের মহিলাটি দেখা করতে বলছে। সন্দেহ এবং কৌতূহল। ইনফর্মার বিনয়কে কাজে লাগিয়ে অনেকগুলি ক্যাফের ঠেক জোগাড় করে একটার নাম দেখে চমকে উঠেছিল। ডি লুনা। ওটা তরুণীর নাম নয়! ক্যাফের নাম!

এরপর একটা স্মাগলার চক্রকে ধরে ফেলা নেহাতই ভাগ্যের ব্যাপার!

কৃপাসিন্ধু দিয়েছে ভাগ্যকে ধন্যবাদ। কিন্তু আর কেউ সেই ঘটনাকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। আপাতত কৃপাসিন্ধুর হাতে কাজ নেই। খবরের কাগজখানা মন দিয়ে পড়ছিল। একটা খবরে চোখ

আটকে গেল। গতকাল শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া এলাকাইয় একটি পাঁচতলা বাড়ি থেকে পড়ে মারা গেছে শুভব্রত চৌধুরী। বাড়ির ছোটছেলে শুভব্রতর সঙ্গে দু'দিন আগে বাড়ির সদস্যদের তর্কাতর্কি হয়। মানসিক বিষাদে সে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।

পুলিশ আশঙ্কা করছে এটি একটি সুইসাইড কেস। কিছুদিন আগে মৃতের পিতা সুখময় চৌধুরী একই ভাবে আত্মহত্যা করেন।

ঘটনাটি খুব স্বাভাবিক। সম্ভবত এটি বংশগত মানসিক রোগ। তারই জন্য আত্মহত্যার প্রতি আকর্ষণ।

হতে পারে। ভাবল কৃপাসিন্ধু। ওর সঙ্গে একটি ছেলে পড়তো। পরাগ। পরাগ সাহা। ভাল ফুটবল খেলে নাম করেছিল। ওর বাবা ছিলেন চা-বাগানের স্টাফ। ওর মায়ের কথা কৃপাসিন্ধু আগেই শুনেছিল। ওর মা নাকি আত্মহত্যা করেছিলেন। একদিন সকালে জ্যাঠতুতো দাদা বিদিত এসে খবর দিয়েছিল পরাগ সুইসাইড করেছে। কেন করেছে, কেউ জানে না। দু'দিন লোকে বলাবলি করল। তারপর সকলে ভুলে গেল। কৃপাসিন্ধু আজও ভোলেনি। পরাগের মৃত্যুটা ওকে আশ্চর্য করেছিল। মিহির স্যার বলেছিলেন আত্মহত্যার একটা আকর্ষণ থাকে। এটা বংশগত হতে পারে। কিন্তু কৃপাসিন্ধু জানে, পরাগ পাগল ছিল না। আত্মহত্যা করার মত মানসিকতা ছিলই না ওর। আগের দিন পরাগ ওকে চপ খাইয়েছিল। বলেছিল ম্যাথসটা একটু দেখিয়ে দিস। ওটায় আমি খুব কাঁচা। দু'জনের মধ্যে কথা হল। কৃপাসিন্ধুদের বাড়ির ছাদে খুব ভোরে চলে আসবে পরাগ। দু'জনে অঙ্ক করবে। পরের দিন সে আত্মহত্যা করল? মাত্র ঘণ্টা চারেকের মধ্যে মানসিক অবস্থার এমন কী পরিবর্তন ঘটে গেল ওর? আশ্চর্য! তাহলে কি পরাগ আত্মহত্যা করেনি? এমন কি হতে পারে না পরাগকে মেরে ফেলা হয়েছিল?

সোজা হয়ে বসে কৃপাসিন্ধু। এই দিকটা কখনওই ভেবে দেখেনি তো! সত্যি করে বলতে গেলে পরাগের মৃত্যুটা অবাক করেইছিল ওকে। ছোট ছিল বলে নিয়মের বাইরের দিকটা স্পষ্ট করে বুঝতে পারেনি তখন। আজ এই খবরটা পড়তেই পরাগ উড়ে এল যেন! সত্যি কি পরাগ আত্মহত্যা করেনি? সত্যি কি পরাগের মা আত্মহত্যা করেছিল?

যাহ। এসব কী ভাবছে! বরং দেখা যাক শিলিগুড়ির খবরটা। এটাও কি পরাগের মত কেস? সত্যি আত্মহত্যা? নাকি খুন? এমন হতেই পারে, বছরখানেক আগে বাবা আত্মহত্যা করেছেন। বাবাকে ছেলেটি অসম্ভব ভালবাসত। তার সেই ভালবাসা কেউ বুঝতে পারেনি বা তার মনের অভাবটা কেউ পূরণ করতেও পারেনি। ভেতরে ভেতরে চরম একাকীত্বে ভুগতে ভুগতে... এই ডিসিশনে এসেছে! এই ঘটনাটি একটি বনেদি পরিবারে ঘটেছে। তাহলে বলা যেতে পারে বিগ মেন হ্যাভ বিগ ফেইলিংস!

কিন্তু! যদি ঘটনাটি আত্মহত্যা না হয়? আত্মহত্যার মত করে মৃত্যুটাকে যদি সাজানো হয়ে থাকে?

কল্পনা করে লাভ নেই। সুইসাইড হোক বা মার্ডার, পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা দেখতে হবে। দেখ কৃপাসিন্ধু, উতলা হতে নেই! একটা সাধারণ ঘটনাকে তোমার মনের চাহিদা মেটানোর জন্য অসাধারণ বানাতে চাইছ! অপরাধ ঘাটতে ঘাটতে তোমার মনটা অপরাধী হয়ে উঠেছে।

হুম, পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা দেখতে হবে।

১৯

সকালে মানসরঞ্জন এসেছিলেন। বাড়ির পরিস্থিতি এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে! কঙ্কাবতী দিদির ঘরের এক কোণে বাবুইকে নিয়ে গুটিয়ে বসে ছিল। বাড়ি ফিরে যাওয়ার অদম্য বাসনা থাকলেও এই মুহূর্তে ফিরে যাওয়াটা খারাপ দেখায়! বস্তুত সুবর্ণা ভেঙে পড়েছে খুব। ওকে ফেলে চলে যাওয়াটা ঠিক নয়!

বাবুই ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। তবু দুর্ঘটনার ছোঁয়া ওর মধ্যেও লেগেছে। অন্যদিনের মত হৈচৈ করছে না। সুবর্ণা দুধ-কর্ণফ্লেক্স নিয়ে এল। দুঃখ সব মেনে নিলেও খিদেকে চাপা দিতে পারে না। বিশেষ করে বাচ্চাকে উপোষী রাখা যায় না।

"কঙ্কা, তুই খাইয়ে দে।"

কঙ্কা কাজ পেয়ে বাঁচল। বাবুই চুপচাপ খেয়ে নিল।

"কঙ্কা, বড্ড শরীর খারাপ লাগছে রে। ও মরে যাবে, কখনও ভাবিনি।"

সোজা হয়ে বসে কৃপাসিন্ধু। এই দিকটা কখনওই ভেবে দেখেনি তো! সত্যি করে বলতে গেলে পরাগের মৃত্যুটা অবাক করেইছিল ওকে। ছোট ছিল বলে নিয়মের বাইরের দিকটা স্পষ্ট করে বুঝতে পারেনি তখন। আজ এই খবরটা পড়তেই পরাগ উড়ে এল যেন! সত্যি কি পরাগ আত্মহত্যা করেনি? সত্যি কি পরাগের মা আত্মহত্যা করেছিল?

"এই সেদিনও সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছিল লাল কম্বল গায়ে দিয়ে! আমার মনে হতেই গা গোলাচ্ছে! বাবা-ছেলে দুজনেই কেন এভাবে চলে গেল? একই ফ্যামিলিতে একই রকম দুর্ঘটনা ঘটলে ভয়ঙ্কর লাগে!"

"আমি ভাবছি মা মানে আমার বড়মণির কথা। উনি আজ খুব দেরি করছেন। কাল নাকি সেই বিশ্রি বুড়িটা এসেছিল। যেদিন বুড়ি আসে, পরের দিন মা খুব দেরি করে ঘর ছেড়ে বের হয়! কী ব্যাপার যে হয় ওই ঘরের মধ্যে! কিন্তু আজ যখন বেরিয়ে এসে শুনবেন, তখন পাগলই হয়ে যাবেন! কী যে করব! এদিকে থানা পুলিশ, ওদিকে পাড়া প্রতিবেশীর নানা প্রশ্নের জবাব খুঁজতে খুঁজতে প্রাণ শেষ হয়ে যাচ্ছে! এ সময় কোথায় সবাই সাহায্যের হাত বাড়াবেন, তা নয়, কেবল ঝামেলার সৃষ্টি করছেন। সারা বছর মুখ দেখাদেখি বন্ধ যে শরিকদের সঙ্গে, তারা হাজির। শুভ তো খুবই ভাল ছেলে ছিল। কী হল হঠাৎ?"

"দেবুদা কোথায়?"

"থানায় গেছে। পোস্টমর্টেম করতে হবে। নীলম আছে। যা, গিয়ে আমার শাশুড়ির সঙ্গে যদি দেখা করতে পারিস, তো ভাল।"

"মানে? তুই পাগল নাকি? এখন শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করব? ওঁর সঙ্গে কথা বলার সাহস নেই আমার। বাবাহ!"

তারপরেও কী মনে হল। কঙ্কা উঠে ঘর থেকে বের হল। আস্তে আস্তে জবালার ঘরের দিকে রওনা হল। ভয় করছে। আবার ভদ্রমহিলার জন্য কষ্ট হচ্ছিল। উনি সত্যি এখনও কিছু শোনেন নি? যখন শুনবেন ওঁর ছেলে আর নেই, তখন ওঁর মনের অবস্থা কী হবে!

ভারি পর্দা সরাতেই একটা গোঙানির আওয়াজ পেল কঙ্কা। ঘরের ভেতরে আবছা অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেমন এক রকম চোখ করে তাকাচ্ছেন বড়মণি। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ভীত চোখে বড়মণিকে দেখছে নীলম।

কঙ্কা অবাক হয়ে গেল। দিদির শাশুড়ির কী বিশ্রি চেহারা হয়েছে! উনি বাঁচবেন তো?

চোখে জল চলে এল কঙ্কার। কেমন সুন্দর ব্যবহার করেছেন গতকাল। কে জানতো আজ তাঁকে এই অবস্থায় দেখতে হবে! কালও কত সুস্থ ছিলেন। স্বাভাবিক ছিলেন! পর্দার আড়ালে কঙ্কাকে দেখতে পেয়েছে নীলম। চোখের ইশারায় সরে যেতে বলল সে। এই মুহূর্তে বড়মণির যা মানসিক অবস্থা, কঙ্কাকে দেখলে আবার কী করবেন কে জানে! মোটেই সামলানো যাচ্ছে না। কে বা সামলাবে! কেউ এ ঘরে এলেই হাতের কাছে যা পাচ্ছেন, ছুঁড়ে মারছেন বড়মণি। বৌদি সুবর্ণা এসেছিল। কিন্তু সে কতক্ষণ আর পাহারা দেবে! অন্যদিক দেখতে হবে! তাছাড়া সুবর্ণার উপস্থিতিতে বড়মণি ঘর থেকে বের হয়নি!

কঙ্কা নীলমের ইশারা বুঝে চলে যাচ্ছিল। এমন ভয়ঙ্কর দুঃখের বাড়ি পৃথিবীতে আর আছে কিনা সন্দেহ। লম্বা বারান্দা পেরিয়ে আসতে আসতে শীত করে উঠল কঙ্কার। হাওয়া দিচ্ছে খুব। জড়োসড়ো হয়ে চাদর জড়াতে যেতেই চমকে উঠেছে কঙ্কা। দেবব্রত আসছে। সঙ্গে পুলিশ!

কেন পুলিশ? দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ওদের যাওয়ার সুবিধে করতে চাইল কঙ্কা। যদিও বিরাট চওড়া বারান্দা দিয়ে যাতায়াতে কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

২০

"আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী শুভব্রতবাবু আত্মহত্যা করেননি। তাঁকে খুন করা হয়েছে। এটা মার্ডার কেস।" পুলিশ ইন্সপেক্টর বিমান চৌধুরী কথা বলতে বলতে উপস্থিত সকলের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন।

বিস্ফারিত চোখে কথাগুলো শুনছিল দেবব্রত। সুবর্ণা, কঙ্কা, নীলম,পদ্ম, ব্রজেন যোগিন... সকলেই ত্রাস বিস্ফারিত চোখে দাঁড়িয়েছিল। জবালা ছিলেন না এখানে। এই মর্মান্তিক খবর তাঁর কানে পৌঁছল না।

"আপনারা...সিওর?" দেবব্রত কী বলতে হবে বুঝতে পারছিল না। শুভকে খুন করবে কে? কে আছে এই রকম মানসিকতার প্রাণী এ বাড়িতে?

"রিপোর্টে ভুল থাকতে পারে। এমন হতেই পারে, তাই না?" সুবর্ণার স্বরে কর্কশতা চাপা পড়ল না। ও বিরক্ত হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। আসলে এই ভাবে পরিবারের দিকে আঙুল তোলা হলে প্রত্যেকেই অস্বস্তিতে থাকে।

"দেখুন, আপনাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। ময়না তদন্ত তখনই হয়, যখন মৃত্যুর কারণ

নিয়ে সন্দেহ জাগে। মৃত্যুর কারণটা ঠিক বোঝা যায় না সাদা চোখে। তখনই পোস্টমর্টেম করতে হয়! যে কোনও দুর্ঘটনাতেই পোস্টমর্টেমের নিয়ম আছে। এই সিস্টেমটাই এরকম যে, ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ...পুলিশ তদন্তের ভার নিয়েছে। আপাতত আমাদের না জানিয়ে আপনারা কেউ কোথাও যাবেন না। আউট অফ স্টেশন হতে বারণ করা হচ্ছে আইনের তরফ থেকে। তদন্তের সুবিধার্থে এই সহযোগিতা আপনাদের করতে হবে।"

"কিন্তু আমাদের মা, উনি অসুস্থ! মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছেন খুবই আঘাত পেয়েছেন ছেলের অকাল মৃত্যুতে। ডাক্তার মাকে নার্সিং হোমে দিতে বলেছেন। নাহলে...!"

"নিশ্চয় নেবেন। আপনাদের বাড়ি থেকে বের হতে তো বারণ নেই!"

পুলিশের আনাগোনা এখন চলতে থাকবে বাড়িতে। পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষ পরস্পরের দিকে সন্দেহের চোখ তুলে তাকাচ্ছে। সম্পর্কের মধ্যে অজানা ঈগলের নখের আঁচড় পড়েছে। সন্দেহের শকুন পাখা মেলে এসে বসেছে বাড়ির ছাদের ওপরে।

মানসরঞ্জন এলেন। হরিণের চামড়ার চটিতে আজ শব্দ উঠল না। অবসন্নভাবে বারান্দার সোফায় বসে পড়লেন।

"জ্যাঠাবাবু, মাকে নার্সিং হোমে দিতে হবে। কেমন করছেন যেন। বাড়িতে রাখা ঠিক নয়। আপনাকে সেই জন্যই খবর পাঠিয়েছিলাম।" দেবব্রতর রুক্ষ চুলগুলো শীতের বাতাসে কাঁপছিল।

"দেবু, শুভ তোমার ভাই ছিল। তুমি কি কিছুই আন্দাজ করতে পারছ না যে ও কেন কার মদতে নিজেকে মারতে পারে? শুভ কি আত্মহত্যা করার মত ছেলে?" মানসরঞ্জন থেমে থেমে অনেক কষ্টে কথাগুলো বলছিলেন। যেন খুব কষ্ট হচ্ছিল শব্দ উচ্চারণ করতে।

ভীষণভাবেই চমকে উঠেছে দেবব্রত। কী বলতে চান জেঠাবাবু? কী বোঝাতে চান?

"আপনি কী করে ভাবছেন শুভ আত্মহত্যা করেছে? শুভ আত্মহত্যা করেছে বা করতে পারে, একথা আন্দাজ করেও আমি চুপ করে থাকব?"

অদ্ভুতভাবে মুখ তুলে তাকালেন মানসরঞ্জন। সে দৃষ্টি যেন চাবুকের মত আঘাত করল দেবব্রতকে। চোখ নামিয়ে নিল ও। জেঠাবাবু জানেন না পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট এসেছে। জানলে কী বলে বসবেন কে জানে!

"তোমার মাকে কখন নিয়ে যাবে? আমি একবার দেখা করব। কিন্তু কী বলব তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে? চোখের দিকে তাকাতে পারব না! আমার মৃত্যুর পরেও আমি শান্তি পাব না। পরলোক বলে যদি কিছু থাকে, সেখানে সুখময়কে কী জবাব দেব? আমি যে কিছুই রক্ষা করতে পারলুম না। তাঁর দেওয়া দায়িত্ব আমি পালন করতে পারলুম না।"

"আপনি এভাবে কেন বলছেন জেঠাবাবু? আমরা কি চেষ্টা করিনি? বলুন? ও সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের পথিক হয়ে পড়েছিল। আমাদের চেনা জানা সহজ পথ শুভ পছন্দ করেনি। আপনি তো জানেন, ওকে ফিরিয়ে আনার জন্য কম চেষ্টা হয়নি!"

জবাব দিলেন না মানসরঞ্জন। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

"আপনি মায়ের কাছে যাবেন বলছিলেন!"

"আজ থাক। ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে বলো না। শুভর শ্রাদ্ধশান্তি কবে করছ? ওটা একটু নিষ্ঠা নিয়ে করো। আসছে জন্মটা যেন শান্তি পায় ছেলেটা। এ জন্ম তো বৃথা গেল।" গলা ভেঙে আসছিল মানসরঞ্জনের।

উনি উঠতে দেবব্রত যোগিনকে সঙ্গে দিয়ে দিল। একা যাওয়া ঠিক নয়।

ওরা চলে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা কেন যে কেঁপে উঠল দেবব্রতর! এটা কোন ইঙ্গিত মানসরঞ্জনের স্বরের মধ্যে?

সব শুনে ভ্রু কুঁচকে রইল সুবর্ণা। গরম শালে ঘোমটা টেনে বসে দেবব্রতর কথা শুনছিল। কঙ্কা বাবুইকে নিয়ে পাশের ঘরে লেপের নীচে শুয়ে গুনগুন করে গল্প করছে। বাড়িতে এরকম দুর্যোগ দেখা দিলে বাচ্চা সামলানোর দায়িত্ব কেউ নিলে বিরাট উপকার হয়। ভাবল সুবর্ণা।

সুবর্ণার ভ্রু দেখে দেবব্রত অন্য কোনও ইঙ্গিত পাচ্ছিল। সুবর্ণা কী ভাবছে, ও জানে।

"কী ভাবছ?"

"কী আর! ভাবছি জেঠুকে তুমি পোস্টমর্টেমের কথাটা জানালে না কেন? কেন আত্মহত্যার ধারণাটা গেড়ে বসতে দিলে? পুলিশ যা সন্দেহ করছে, সেটা প্রকাশ করাই ঠিক ছিল না? আত্মহত্যার ধারণা থেকে জেঠু তোমার দিকে অভিযোগ করছেন।"

"তুমি বুঝতে পারছ, শুভর আত্মহত্যার ধারণা থেকেই উনি যেভাবে রিয়াক্ট করলেন, সেখানে যদি পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট শুনতেন, তাহলে কী হত বল! আমি আসলে ভয় পেয়ে গিয়ে এটা করেছি। ওঁকে কিছু বলতে যাওয়া মানে...!"

"এখন কী করবে?"

"কিছুই করব না। ওকে সব জানাতে হবে, তারই বা কী মানে আছে? কিচ্ছু নেই! সত্যি বলতে উনি আমার বাবার আত্মীয়। আমাদেরও আত্মীয়। কিন্তু এতটা গার্জিয়ানগিরি করবেন, এটাও মানা যায় না!" দেবব্রত ক্ষোভ প্রকাশ করে।

"ভুল করো না। সবেরই মানে আছে, এটাও মনে রেখ। তুমি জেঠুকে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অবশ্যই জানাবে। বলবে, এইমাত্র রিপোর্ট পেয়েছ।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে। এমন হচ্ছে সব কিছু, যেন আমিই খুন করেছি!" দেবব্রত বিরক্ত চোখে সুবর্ণার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। সুবর্ণাও মানসরঞ্জনের মত করে তাকাতে শিখেছে কবে থেকে?

"এই, ওখানে কে? দেখ, দেখ, কেউ দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছে!" সুবর্ণা ফিসফিস করতেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছে দেবব্রত। মনে হল, কেউ দ্রুত সরে গেল।

একটা লাফ দিল দেবব্রত। পর্দা সরাতেই কাচুমাচু পদ্ম, "—বড়দাবাবু, নিচে পুলিশ এসেছে। আপনাকে ডাকাডাকি করে চলেছে। তাই আমি...!"

দেবব্রত অবাক হল। পদ্ম এখন এখানে কেন? ওকে মায়ের কাছে থাকতে বলা হয়েছিল। ও এখানে কী করছে? আশ্চর্য কান্ড তো।

"তুমি নিচে বা কেন গিয়েছিলে শুনি?" সুবর্ণা কথা ছুঁড়ে দিল, "এখানে কে আসতে বলেছে তোমাকে?"

"আমি ভেবেছিলাম, ব্রজেনকে জিজ্ঞাসা করে দেখি কিছু দরকার আছে কিনা! তাই কিচেনে গিয়েছি।" পদ্ম চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারছিল না। বোঝা যাচ্ছে ওর অস্বস্তি হচ্ছে।

সুবর্ণা পদ্মকে চলে যেতে বলল। পদ্ম চলে যেতেই দেবব্রতর দিকে ঘুরে তাকাতে দেখে দেবব্রত নিচে নামার জন্য পা বাড়িয়েছে।

"কী ব্যাপার বল তো?"

"বাড়িতে খুন হলে পুলিশের আনাগোনা চলবেই। এসব নিয়ে ভেব না। আসছি আমি।" দেবব্রত নেমে গেল নিচে। সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। সুবর্ণা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেবব্রতর কথা ভাবে। সুবর্ণার চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিল দেবব্রত। কেন? ও ভয় পেয়েছে! কিসের ভয়?

এক ঝলক কঙ্কা আর বাবুইকে দেখে সুবর্ণাও নিচে নামার জন্য পা বাড়াল। কী কথা হচ্ছে নিচে জানা দরকার।

একতলায় বসার ঘরের সামনে ওঁরা সব দাঁড়িয়েছিলেন। দেবব্রতকে দেখে অফিসার বিমান চৌধুরী এগিয়ে এলেন, "আপনার মাকে কখন নার্সিং হোমে নিচ্ছেন?"

"ঘণ্টাখানেক পর।"

"আপনাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদের তো ডিউটি পালন করতেই হবে। কিছু অপ্রিয় কাজ করতে হবে। আপনার মায়ের যেমন অবস্থা বলছেন, তাতে তাঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে কি? প্রয়োজনে বলতে হবে সেটা বলে রাখছি। তদন্তের প্রয়োজনে আপনাদের সহযোগিতা চাই আমরা। আপনারাও নিশ্চয় সেটা চাইবেন। আপনাদের বাড়ির একজনকে মেরে ফেলা হল, আপনারা বিচার চাইবেন, আমরা সেটা আশা করব, তাই না?" বিমান চৌধুরীর চোখ উপস্থিত মানুষগুলোকে জরিপ করছিল যেন।

"অফকোর্স! বলুন,কী জানতে চান।"

"এখন নয়। আমরা আগামীকাল আসছি কিছু জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। আপাতত ছাদটা একবার দেখব।"

এতক্ষণ আর একজনকে খেয়াল করেনি দেবব্রত। দীর্ঘদেহি, শার্প চেহারার লোকটি যে একজন পুলিশ অফিসার, সেটা বিমান চৌধুরী না বলে দিলেও না বোঝার কারণ ছিল না। প্রথমত ইউনিফর্ম। তাছাড়াও লোকটির চোখে মুখের দৃঢ়তা বলে দিচ্ছে এঁকে সহজে ছোঁয়া যাবে না।

"আসুন স্যার।" সেকেন্ড অফিসার তাঁর দিকে ফিরে তাকাতে কৃপাসিন্ধু দেবব্রতর দিকে তাকাল, "আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে।"

ওরা ছাদে পৌঁছতে আশেপাশের বাড়িগুলোর জানালা ধপাধপ বন্ধ হয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে কোনও মন্তব্য করল না কৃপাসিন্ধু। এগিয়ে গেল ছাদের কার্নিশের দিকে।

"আপনার ভাই, শুভব্রতবাবু ঠিক কোন জায়গা থেকে পড়েছিলেন বলে মনে হয়? কোথায় পড়েছিলেন? এখান থেকে বোঝাতে পারবেন?"

"হ্যাঁ। ...ঐ যে, দেখতে পাচ্ছেন? মার্ক দিয়ে রেখেছে পুলিশ।"

ছাদের উত্তর-দক্ষিণ কোণ বরাবর এগিয়ে গেল কৃপাসিন্ধু। এখানেই দাঁড়িয়েছিল শুভব্রত। হুম। পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল কি! নাকি কারও মুখোমুখি? রিপোর্ট বলছে পেছন ফিরেছিল। তাহলে ওয়াল টপকে পড়ল কী করে? ঝাঁপ দেয়নি। ওকে ঠেলে ফেলেছিল কেউ! কেউটি! একটি কেউটে। আচ্ছা ছোবল বসিয়েছে। কেন বসালো ছোবল? তার

পাকা ধানে কি মৈ দিয়েছিল শুভব্রত? পাকা ধানটা কী? সম্পত্তি?

এইখানটিতে এসে লোকটি দাঁড়াল গায়ে ভুসো চাদর গায়ে দিয়ে। ঠান্ডা ছিল সেদিন। সাত ডিগ্রি। ওই ঠান্ডায় রাতের বেলায় ছাদে কেন এল শুভব্রত? কেউ ডেকেছিল? আত্মহত্যা যদি না হয়, তাহলে কেউ ওকে ডেকে ছাদে এনেছিল নিশ্চয়। প্রশ্ন হল, কে ডেকেছিল নিশির ডাক? ডেকে এনেছিল। শুভব্রত এসে দাঁড়াল এখানে। অপেক্ষায় ছিল। সে এল। এসে নিঃশব্দে পেছন থেকে ধাক্কা দিল। অতলে তলিয়ে গেল শুভব্রত।

"আপনার ভাইএর শরীরে শক্তি ছিল? নাকি ল্যাকপেকে? তাগড়াই?"

"নাহ !"

"সে কি ড্রাগ নিত?"

"নিত।"

"কী নিত?"

"চরস, গাঁজা, হেরোইন। আর কী জানি না। হ্যাঁ ম্যানডেক্স, ভাঙ-ও খেত।"

"এগুলোর নাম জানলেন কী করে?"

"ও বলেছিল। ঝগড়া হয়েছিল আমাদের। আমি বলেছিলাম ড্রাগ নিস বলে তোর মাথা কাজ করে না। গাঁজা খেয়ে তোর শক্তি কমে গেছে। তখন বলেছিল, "শুধু গাঁজা নয়, চরস, হেরোইন সব খাই। আরও অনেক কিছু খাই। এবারে সাপের বিষ নেব।" শরীরে জোর নেই। কেবল মুখ ছিল। কথা শোনাতো আমাদের। চোখা চোখা কথা। বিঁধিয়ে দিত।"

"কেন কথা শোনাতো?"

"মানে...," থতমত খেল দেবব্রত, "কথাবার্তা শুনতো না। বন্ধুবান্ধব নিয়ে, নেশাভাঙ নিয়ে থাকলে শাসন করতে হবেই। তখন রেগে গিয়ে যা তা বলতো।"

"উনি অন্যধারার মানুষ ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ এরকম হলেন কবে থেকে? বিশেষে করে আপনি একেবারেই অপোজিট যখন! সাধারণত বড়দের দিকেই যায় ছোটরা। পুরো পালটে যায় বদ সঙ্গে পড়লে। বদ সঙ্গে পড়ার জন্য একটা কারণের দরকার হয়। সেটা কী?"

"জানি না। ছোট থেকেই ও খুব জেদি। যা চাই, এখনই দিতে হবে। প্রশ্রয় পেয়ে আরও বেড়েছিল।"

"কী করে বুঝতেন যে শুভব্রতর শরীরে শক্তি নেই?"

"সেটা বোঝা কঠিন নয়। একবার হল কি, বাবার অকালমৃত্যুর পরে মা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পড়ে যান। আমি দূরে ছিলাম। চিৎকার করছি— শুভ, মাকে তোল, মাকে তোল। ও মায়ের কাছেই ছিল। ও তুলছে না। কিরকম করছে। কাছে এসে দেখি ওর হাত পা থর থর কাঁপছে। মাকে টেনে তুলতে হাঁপিয়ে যাচ্ছে। ...এরকমই ছিল। কাজ করত না। একটু ...অ্যাবনর্ম্যাল।"

বিশাল ছাদখানা খা খা করছে। একপাশে ছোট ছোট চারটে পিলারের ওপর পরিত্যক্ত জলের ট্যাঙ্ক। অন্য পাশে নতুন জলের ট্যাঙ্ক বসানো হয়েছে। পাশে দুটো রেক্সিনের গদী আঁটা মোড়া। চকচকে ছবি মোড়ার গায়ে।

"এ দুটো... কারা আসে ছাদে?"

"বাড়ির কাজের লোকেরা ছাড়া তো... বলতে পারব না।" দেবব্রত মোড়াদুটো দেখে।

পাশের বাড়ির জানালা অল্প খুলে রাখা। আড়ালে কেউ লক্ষ্য করছে।

"কারা থাকে ওদিকে?"

"আমাদেরই শরিকরা। ঠাকুর্দার বাবার বিরাট সম্পত্তি ছিল। তারই ফলশ্রুতি এই শরিকি ঝামেলা। চলছে চলবে।"

খোলা জানালার ওপাশে কে দাঁড়িয়ে?

কৃপাসিন্ধু নেমে আসছিল। সিঁড়ির ধাপগুলো নীচু নীচু। দ্রুত যাতায়াত করা যায়। প্রায় শোয়ানো ধাপ।

২১

"দত্ত, আমাকে শুভব্রত সরকারের পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা দাও।"

কৃপাসিন্ধু থানায় এসেছে কিছুক্ষণ। অনেকক্ষণ কথা বলেছে ডাক্তার এম আর বিশ্বাসের সঙ্গে। কয়েকটা ব্যাপারে ওর একটু ধাঁধা ছিল। সেটা মেটাতেই এই আলোচনা।

রিপোর্ট দেখছিল কৃপাসিন্ধু।

দত্ত কিছু বলবে বলে দাঁড়িয়েছিল। কৃপাসিন্ধু সেটা বুঝেই তাকাল।

"স্যার আমি বলছিলাম, কেসটা যদি সুইসাইড কেস হয়, তাহলে কি... মানে বলছিলাম রিপোর্টের ওপর আমরা বিশ্বাস করছি কেন?"

প্রশ্নটা তবু মনের ভেতরে নাগরদোলার মত পাক খাচ্ছে। স্যার না হয় অন্য দৃষ্টিভঙিতে মৃত্যুটাকে দেখছেন। অথচ সহজ দৃষ্টিতে একে সুইসাইড বলেই মনে হচ্ছে। তাহলে আবার প্রশ্ন আসবে যে ভদ্রলোক ইয়ং বয়সেই এমন কিছু আঘাত পেয়েছেন, যার জন্য তাকে মৃত্যুকে বেছে নিতে হল। আবার প্রশ্ন, আঘাত কে দিল? সে কি বাইরের কেউ? নাকি সমস্যাটা বাড়ির ভেতরেই রয়েছে?

"তুমি একটু পড়াশোনা কর। এ লাইনে উন্নতি করতে চাইলে অনেক জানা দরকার। যে প্রশ্ন করলে, সেটা বাইরের কারও কাছে না করাই ভাল। ডাক্তার বিশ্বাসের সঙ্গে এতক্ষণ আমাকে আলোচনা করতে দেখলে। উনি সেই ডাক্তার, যিনি শুভব্রতর পোস্টমর্টেম করেছেন। আত্মহত্যা ও খুনের মধ্যে খুব বড় একটা পার্থক্য রয়েছে। একটা স্বেচ্ছায় ঘটে, অন্যটা অনিচ্ছাকৃত। এক্ষেত্রে মৃত্যু যেভাবে হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে লাশ উপুড় হয়ে পড়েছে। এ থেকে মনে হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি ছাদে ঢোকার দরজার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল।"

—"সেটা তো নিজে থেকে ঝাঁপ দিলেও ছাদের দরজার দিকে পেছন ফিরেই দাঁড়াতো!"

—"ঠিক। যদি তাই হত তাহলে কতগুলো বিশেষ ঘটনা ঘটতো। এক্ষেত্রে দেখছি, স্কলার ফ্র্যাকচার হয়েছে। এক্সটেন্সিভ আঘাত, হাড় ভেঙে গেছে। ইন্টারন্যাল অর্গ্যান্স, লাংস ড্যামেজড। ফ্রন্ট ক্রেনিয়াল বোন এক্সটেন্সিভ ড্যামেজ হয়েছে। ফ্রন্টাল, টেম্পোরাল, অক্সিপিটাল, নেজাল বোন, সুচার, কলার বোন, সারভাইকাল ইঞ্জুরি। কপালের ভেতরের হাড়ের এক জোড়া অর্থাৎ স্পচার ভেঙে ছে। নাকের হাড় অর্থাৎ নেজাল বোন ভেঙে থেবড়ে গেছে।"

—"এ থেকে কী প্রমাণ হল স্যার? সুইসাইড করলে কি এসব ইনজুরি হত না?"

—"ওখানেই মূল রহস্য দত্ত। নিজে থেকে লাফ দিয়ে পড়লে যে ভেলোসিটি, তার চেয়ে আচমকা ধাক্কাতে বেশি আঘাত হবে। এখানে ভেলোসিটি বেড়ে যাবে। ফলে আঘাতের পরিমাণটা বেশি হবে। মাস ইনটু ভেলোসিটি। ড্যামেজটা নির্ভর করছে কতটা উঁচু থেকে পড়েছে।"

—এখানে মাধ্যাকর্ষণটা একই রকম থাকবে না বলছেন?

—"ইয়েস। নরম্যালের চেয়ে আচমকা ধাক্কায় ফোর্সটা বেশি হবে। তাছাড়া তুমি যেটা বলছ। ইনজুরি। ইনজুরি হবে দু ক্ষেত্রেই। কিন্তু সবচেয়ে বড় হল ইনজুরির ধরনটা। সুইসাইড হলে শুভব্রতর পায়ের হাড় ভাঙত। একে লোয়ার এক্সিটিসিটি বলে। এতে সুইসাইড বোঝানো যায়। নিজে থেকে লাফ দিলে পা যেভাবে পড়বে, তাতে পায়ের হাড় ভাঙবে। কিন্তু শুভব্রতের ক্ষেত্রে সেটা হল না। এর ড্যামেজগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা সুইসাইড কেস নয়। শুভব্রতকে কেউ সুস্থ মস্তিষ্কে খুন করেছে।"

—"কেন?"

—"প্রশ্নটা সেখানেই। কেন? কেন ওকে খুন হতে হল? খুনি কে? তার মোটিভ কী? মনটাকে দুই ভ্রুর মাঝে নিয়ে এস। মনসংযোগ কর। অনেক ফাঁক ফোকর ধরা পড়বে।" নিজেকেই যেন বোঝাচ্ছিল কৃপাসিন্ধু।

দত্ত বহুদিন থেকেই কৃপাসিন্ধুকে জানে। ও আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। স্যার এখন একা থাকবেন। কিন্তু প্রশ্নটা তবু মনের ভেতরে নাগরদোলার মত পাক খাচ্ছে। স্যার না হয় অন্য দৃষ্টিভঙিতে মৃত্যুটাকে দেখছেন। অথচ সহজ দৃষ্টিতে একে সুইসাইড বলেই মনে হচ্ছে। তাহলে আবার প্রশ্ন আসবে যে ভদ্রলোক ইয়ং বয়সেই এমন কিছু আঘাত পেয়েছেন, যার জন্য তাকে মৃত্যুকে বেছে নিতে হল। আবার প্রশ্ন, আঘাত কে দিল? সে কি বাইরের কেউ? নাকি সমস্যাটা বাড়ির ভেতরেই রয়েছে? পরিস্থিতিটা কেমন ছিল যে খুনির পক্ষে তাকে না মেরে উপায় ছিল না! ধরা যাক, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অনুযায়ী শুভব্রত খুন হয়েছে। তাহলেও একই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসবে।

—"ভাব দত্ত। তবে দ্রুত নয়। ধীরে ধীরে এগোও।"

—"চমকে উঠেছিল বলে জোর ব্যাথা পেল দত্ত। উফ! টেবিলটা এমন শক্ত !"

—"এত মগ্ন ছিলে কী নিয়ে? শুভব্রত?"

—"আসলে স্যার... ভাবছি, খুন কেন?"

—"ঠিক। খুন কেন? সেটাই বড় এবং একমাত্র প্রশ্ন। খুনের মোটিভ। সেটা পেলেই সব রহস্যে জল ঢেলে দেওয়া যায়। প্রথমেই খুঁজতে হবে মোটিভ। কে খুন করল সে প্রশ্ন পরে আসবে। প্রথমে ভাব কেন! কেন খুন। কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি ধীরে ধীরে সব জট খুলে যাবে। অঙ্ক তখন জলবৎতরলম। আগামীকাল বাড়ির সকলের সঙ্গে কথা বলার প্রোগ্রাম রেখেছি।" *(ক্রমশ)*

গল্প

বাড়ি বদল

অর্পিতা গোস্বামী চৌধুরী

ক'দিন থেকে ভাবছি কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট কিনব। নেট জোড়া বিজ্ঞাপনের মেলা আমার চোখের সামনে। মৌন কিছুতেই রাজি নয়। আজ সকালেও অফিস যেতে যেতে এই নিয়ে কথার কাটাকুটি চলল। ও বলল, তুমি আমাকে এসব বলে মাথা খারাপ কোরো না তো। বললেই কি, আমার স্বপ্ন থেকে বিদায় নেবে ওরা? সবাই কলকাতায় একটা করে ফ্ল্যাট কিনছে, আমরা কেন নয়? বিট্টুও এখন কলকাতায়।

দু'দিন কামাই দিয়ে কাজে এল পপি। থমথম করছে মুখ। ভেতরে ভেতরে এতো মেজাজ খারাপ হয়েছিল যে কী বলব। কিন্তু মস্ত বড় কোন এক গুরুর বাণী অনুসরণ করে নিজের আত্মাকে বললাম "কন্ট্রোল কন্ট্রোল"। মুখ খুলেছি কি মরেছি। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে উঠবে শ্রীমতী। "দিদি তুমি অন্য লোক নিয়ে নাও তবে।" তার চেয়ে বাবা নিজেকে শান্ত রাখাই অনেক সহজ কাজ। কামাই দেওয়ার আগের দিনও খুব তাড়াহুড়ো করে কাজ শেষ করেছিল। দুধের বাসনটা থেকেই গিয়েছিল এক কোনায়। কী যে ব্যাপার! অন্য কোথাও আবার নির্ঘাত কাজ ধরেছে। মাথার মধ্যে রাজ্যের জল্পনা কল্পনা নিয়ে ঘন্টাখানেক পার করলাম। ওর কাজও মোটামুটি শেষের পথে। বুকে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে যতটা সম্ভব মোলায়েম কণ্ঠস্বরে বললাম, পপি কী ব্যাপার রে, কী হয়েছে! দুদিন এলি না, মুখটাও শুকনো! ইয়েস, 'গোমড়া' শব্দের পরিবর্তে আদর করে 'শুকনো' কথাটাই ব্যবহার করলাম। আদরে গলে গেল পপি রানি।

—আর বলো না দিদি, সেদিন রাতে দেখি আগের পক্ষ এসে হাজির। কেন বাপু, গেছিলি তো খুব গুমর করে, ফিরে এলি কেন!

—কে ফিরে এলো! আগের পক্ষ! আগের পক্ষ মানে!

—মানে বোঝো না? ওনার আগের বউ গো।

—তোর বরের আবার আগের পক্ষ আছে নাকি!

—কী আবার, আমার পোড়া কপাল।

—তো এমন ছেলের সাথে বিয়ে করলি কেন!

—সে কি আমি জানতাম! তখন কত মিষ্টি মিষ্টি কথা! আসলে সতীনটার তো চরিত্র ভাল ছিল না, কী করবে বেচারা! নিত্যদিন ঝগড়া আর ঝগড়া। সেই বছরও ঘুরল না গেল চলে। বলেছিল ইয়ে করতেও নাকি আসবে না ওনার বাড়ি। তা সেদিন এসে হাজির। সব তেজ ফুটো। বিক্রি হয়ে গেছিল শুনেছি।

শেষের কথাটা বলল ফিসফিস করে।

—কী করে জানলি!

—এসব কথা কি চাপা থাকে! আমার সংসারের কি একটা কল্যাণ অকল্যাণ নেই গো! তবু কিছু বলি নি। কী জানি পুরুষ মানুষের মন, কখন কোন দিকে ঢলে। তবে আমাদের ওর আবার খুব ন্যায্য অন্যায্য জ্ঞান গো।

গদগদ হয়ে উঠেছে পপির মুখ।

—বলেছে ঠাঁই হবে না এ ঘরে। এ ঘরে তোর আর কোনও অধিকার নেই।

—তা তোর দুঃখ কেন!

—গেল তো কাল গো।

—তা তোদের তো একটাই ঘর, তোরা ঘুমালি কি একসাথে!

মনে একটা রসবোধ পাক দিয়ে উঠেছিল। চা দিলাম ওকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল পপি। যেন কথাগুলো সাজিয়ে নিচ্ছে। তারপর নিচু গলায় আবার শুরু করলো, রাতে তো ওনার পুরাপুরি হুস থাকে না, ডাইনিটা আমার স্বামী, আমার স্বামী করে ডাকল আর সেও ঢুকে পড়ল ঘরে যেন কতদিনের দুঃখী মানুষ দুজন! আমাকে ঘর থেকে বের করে দিল। ছেলেটার কথাও ভাবল না। আমরা বারান্দায়—।

চোখ মুছল পপি। রসিকতাটার জন্য হঠাৎ খুব অনুতাপ হল।

—দু'দিন খুব রাজত্ব করল, যেন ওরই বাড়ি। আমি লোকের বাড়ি কাজ করে ঘরে টিন লাগালাম, কাঠের দরজা বানালাম আর ওটা বলে ওর বাড়ি! ছিল তো ভাঙা বেড়া আর ভাঙা এসবেস্টর। দরজা নাই, রান্না ঘর নাই। আমি দু'বেলা লোকের এঁটো ঘেটে—।

—তোর বর—!

—সে কী করবে, দারু খেয়ে জুয়া খেলে—! উলটে আমার লুকানো পয়সা কেড়ে নিয়ে চলে যায়।

একটু থেমে বলে, কাল সন্ধ্যায় লাথি মেরে ভাগিয়ে দিয়েছে।

—যাকগে আপদ গেছে তো, আবার দুঃখ কীসের?

আবার চুপ করে থাকল পপি। এবার অনেকক্ষণ। বাকি চা-টা শেষ করে কাপটা ধুয়ে রাখল। তারপর ধীরেসুস্থে আঁচলে মুখ মুছে বলল, দিদি ও যদি সত্যি আমার বাড়িতে পার্মানেন্ট থাকতে শুরু করে এসে! কার বাড়ি ওটা! বলছিল, ও বাড়িতে নাকি ওরই অধিকার। আমি তবে—।

কথা শেষ করল না পপি। দীর্ঘশ্বাসগুলোকে গিলে খাচ্ছিল যেন একটু একটু করে। বহু কষ্টে ওগুলো ফুসফুসে বন্দি করে টলমল উঠে দাঁড়াল।

চলে গেছিল পপি। আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল ওর কথাগুলো। কতক্ষণ কে জানে। পাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসছে গানের রেওয়াজি সুর। ভৈরবী মূর্ছনায় নরম সকাল। বনি চেঁচাচ্ছে, কার উপর কে জানে! নিলয় বাবু! মনটা অন্যরকম হয়ে গেল। ভাল লাগছিল ওদের বাড়ি থেকে ছুটে আসা প্রাণের শব্দগুচ্ছ। বহুদিন পর ও বাড়ি জেগে উঠেছে। মৌন চলে গেলে আর কোন সজীবতা থাকে না আমার যাপন ছন্দে। একটু পরে বনিদের বাড়িটাও চুপ হয়ে গেল। নিলয়বাবু বনি দুজনেই শিক্ষকতা করেন। মেয়েরাও স্কুলে। সুতরাং ওদের বাড়িও ফাঁকা।

বেল বাজল। মাছওয়ালা মাগুরমাছ দিয়ে গেল। সুন্দর করে কেটে পিস করা। শুধু লবণ হলুদ দিয়ে কড়াইতে চাপাতে দেরি। ওগুলো ধুতে ধুতে মনে পরে গেল বহুদিন আগের এক ঘটনা। সন্ধ্যায় একদম জ্যান্ত মাগুর কিনে এনেছিল মৌন। তখন কাজের লোক থাকে না। সুতরাং হাঁড়িতে জল দিয়ে রাখতে হবে। ভয়ে ভয়ে মাছগুলো ঢালতে গিয়ে সে এক কাণ্ড। মৌন তো মাছ বাড়িতে রেখেই বেরিয়ে গেছিল। এদিকে মাছগুলো সব মাটিতে পরে তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে শুরু করল। আর ওদের ভয়ে আমারও অবস্থা সেই জল বিন মছলির মতই। একসময় আবিষ্কার করলাম তারস্বরে চিৎকার করছি আমি। বিনু বৌদি জানলা দিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ বারিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে! আমার কি আর তখন বলার ক্ষমতা আছে! শেষে বৌদি এসে উদ্ধার করেছিল আমাকে। আজ সেদিনের মত চিৎকার করতে ইচ্ছা করছিল আবার। জানি কেউ শুনলে আমাকে নির্ঘাত পাগল বলবে। কিন্তু কেউ নেইই যে শোনার। ত্রিসীমায় কেউ নেই। আমি সেদিনের স্মৃতি মন্থন করে প্রথমে আস্তে চিৎকার করলাম। তারপর আর একটু জোরে তারপর আরও জোরে। আরও আরও আরও—। কে যেন কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, "চিল্লাও জিতনা জোরসে চিল্লা সকতি হো চিল্লাও। অউর জোরসে হাঃ হাঃ হাঃ। কই নহি শুননে বালা।"

বস্তা থেকে মাটি ঢালছিল নিলয় বাবু। ছাদের উপর ঢিপি হয়ে জমছে সে সব। পাশে বসে তিয়া আর সিয়া মন দিয়ে দেখছিল। একটা একটা করে বস্তা খালি হচ্ছে আর তৈরি হচ্ছে পাহাড়। পশ্চিমে সূর্যও নেমে যাচ্ছে একটু একটু করে নিচের দিকে। আকাশ জুড়ে ধূসর আর লাল রঙের সন্ধি সমাস।

এমন বেলায় আমার মন বড় কেমন করে। আনন্দ নাকি বিষণ্ণতা ঠিক বুঝি না। তবে মন কেমন পাখির মত হয়ে যায়। ঘরে ফেরার সুখে ঝাঁক বেঁধে উড়ে যাওয়া পাখিদের দিকে এক মনে চেয়ে থাকি। এখন আর ঝাঁক বাঁধা টিয়াদের বেশি দেখা যায় না। আগে যেত। ওরা দল বেঁধে ফিরে আসত উঁচু আম কাঁঠাল গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে অথবা বট গাছে রহস্য বাসায়। আমরা না জানি কার জমিয়ে রাখা উঁচু বালি অথবা মাটির ঢিপি বেয়ে পায়ে পায়ে উঠে যেতাম উপরে যেন এভারেস্ট-এর চূড়ায়। আবার সরসর করে নেমে আসতাম যেন বরফ কেটে। বালি মাটি মেখে বাড়ি ফিরে মায়ের বকুনি আর কে আটকায়! একবার আমি আর দিদি কী করেছিলাম, সে কালিপুজার পরপর। এক বাক্স চকলেট বোম থেকে সব বারুদ বের করে একটা কাগজে রেখে —আরে আমার কোনও দোষ ছিল না, যত দোষ সব দিদির। ওই তো বুদ্ধিটা দিয়েছিল। তা সেটা মাকে কে বোঝাবে! দুপুরে ঘুমিয়েছিল, বারুদ পোড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে দেখে আমাদের সামনের চুল ভুরু সব পুড়ে গেছে। সে তো আর এখনকার মা নয়, সে তখনকার মা। কোন আহা উহুর বালাই নেই। সোজা উত্তম মধ্যম।

ইসস কোথায় থেকে কোথায় চলে এলাম। একেই বলে চিন্তার গতি। নিলয়বাবু বস্তা থেকে মাটি ঢালছিল, সব বস্তা ঢালা হয়ে গেছে। এবার সার মেশানো হল। কখন যে অন্ধকার হয়ে গেল ঝুপ করে। ওদের ছাদে একটা হলুদ বাল্ব লাগানো। আজকাল আর কেউ হলুদ আলো লাগায় না। তাই ওটা একটা নস্টালজিক ভাব তৈরি করছিল। কেউ যেন না ভাবেন, কাজ নেই তখন থেকে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের কারবার দেখে যাচ্ছে। মোটেও না। আমার ছাদেও গাছ আছে এবং সেটা মোটেও কম নয়, ওনেকগুলোই। আমি এতক্ষণ গাছে জল দিয়েছি, ঘাস তুলেছি—।

নিজের কাজ করতে করতে অন্যের কাজ দেখছিলাম। তাতে কী ক্ষতি হয়েছে! তা ছাড়া নিলয়বাবুরা একদম নতুন এসেছে। লাগালাগি ছাদ। এটুকুতো দেখাও উচিত। না হলে ওদের সম্বন্ধে ধারণা তৈরি হবে কেমন করে! নিলয়বাবু নিচে নেমে গেল। তিয়া সিয়া একটা লাঠি দিয়ে গোল গোল করে ঘুরিয়ে সার মাটি মেশাচ্ছে। আমারও কাজ শেষ। বেশ ভালো লাগছিল মেয়ে দুটোকে দেখতে। রেলিংএ গিয়ে গালে হাত দিয়ে দাঁড়ালাম। উপরে একটা তুলসী বেদী বানিয়েছে। বনি এল প্রদীপ দেখাতে। আমাকে দেখে দাঁড়াল। হেসে বলল, আর বলো না দিদি এই তো স্কুল থেকে এলাম। স্নান করে প্রদীপ দেখিয়ে এখন চা করব। আজ এ দুটোর তো ছুটি ছিল, কি যে করে রেখেছে ঘরের অবস্থা কী বলব। আমি হাসি হাসি মুখ করে শুনছিলাম। বনি কথা বলতে বলতে নিচে নেমে গেল তাড়াহুড়ো করে। যাওয়ার সময় মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলল, হাতে পায়ের কি ছিরি হয়েছে! নিচে গিয়ে স্নান করবি সব। ওরা নড়ল না। বাবার দেওয়া কাজটা খুব পছন্দ হয়েছে বোঝা গেল। মায়ের কথাও—।

গালে হাত দিয়ে রেলিং-এ দাঁড়িয়েছিলাম আমি। এখন আমার কোন কাজ নেই। বনি যদি দাঁড়িয়ে আমার সাথে আধঘন্টা এমনকি একঘন্টাও গল্প জুড়তো তবে বেশ কেটে যেত সন্ধ্যা। কিন্তু ওর সময় নেই। চাকরি আর ঘর সামলে নিজেই ল্যাজেগোবরে।

বিনু বৌদিরা আগে ছিল এই বাড়িতে। বিনু বৌদিও চাকরি করত না। শীতে দুজনেই রোজ ছাদে লেপ দিতে উঠতাম। সারাদিন কেটে যেত ভেজা জামা কাপড় উলটে পালটে দিতে অথবা লেপ গরম করতে। মিষ্টি রোদে পিঠ দিয়ে ভাতের থালাও ছাদে উঠে আসত প্রায়। তবু গল্প আর ফুরত না। কোথা থেকে আসত এত গল্প! বৌদির মেয়ে বড় হয়ে উঠছিল। ওর পড়াশোনার পেছনে বৌদির দায়িত্ব কমছিল। আমার বিটুও বড় হচ্ছিল, ওকে এখন পড়াতে হয়। ও স্কুল না গেলে ছাদেই চলত পড়াশোনা। গরমের দিনে আকাশ ভরা তারায় তারায়, ওদের বাড়ি হাসনুহানা আমার বাড়ির বেলি গন্ধ, আহা এমন একাকার মিষ্টি গন্ধ কতদিন পাই না। কল্পনার গন্ধ নাকে টেনে নিতেই চোখটা ভেজা ভেজা মনে হল। আমি রেলিং এর গা ছেড়ে উঠে এলাম। একটু হাঁটব এখন। দুই হাত দুই দিকে জোড়ে লেফট রাইট করার মত কায়দায় হাঁটতে থাকি ছাদের এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। যেদিন বিনু বৌদিরা বাড়ি বিক্রি করে চলে গেল ঠিক সেদিনই বাড়ির সামনে মিউনিসিপালিটি থেকে একটা কৃষ্ণচূড়া লাগিয়েছিল। কত বড় হয়ে গেল গাছটা দেখতে দেখতে। এবার কি ফুল ফুটবে? হেমন্তের হাওয়ায় দুলছে ওর ডালপালা। ভাবছিলাম গাছটা কতদিনে আরও বড়, অনেক বড়, যখন ডালপাতা ছড়িয়ে আকাশের দিকে আহ্বানের ভঙ্গিমায় দাঁড়াবে তখন ওতে উড়ে আসবে টিয়া পাখির দল!

আমার স্কার্টের একপাশ উড়ছিল হাওয়ায়। না আঁচল নয়। শাড়ি পরা ছেড়ে দিয়েছি বহুদিন। আগে পরতাম, শ্বশুরবাড়িতে থাকতে। তখন শুধু রাতে নাইটি আর ঘুরতে গেলে চুড়িদার। এ বাড়িতে এসে ওসব বালাই নেই। বাড়ির সামনের মাঠ থেকে খোলা হাওয়ারা ছুটে এসে বুক ভরিয়ে দেয়। আমিও মন জুড়াই। এখন যা ইচ্ছা পরি। পাড়াতেও কেউ বলাবলির নেই। অবশ্য পাড়া আর কী! সামনে মাঠ বাকি দু'দিকে কোনও বাড়ি নেই। নতুন বসতি গড়ে উঠছে। আমার তখন একমাত্র প্রতিবেশী বিনু বৌদি। বৌদির ওপাশের বাড়ির লোকগুলোও সেভাবে মিশত না, ফলে ওরও ছিলাম একমাত্র আমি। খুব ভালো কাটছিল দিন গুলো। মৌন খুশি ছিল না। পুরনো বাড়ি ছেড়ে এসে ও খুশি হয় নি। কেন যে হয় নি কে জানে। ও বাড়িতে তো মা বাবাও ছিল না। তারা গত হয়েছেন বহুদিন। তবে! আমারও তো একটা বাড়ি ছিল সেখানে আমার প্রিয় লোকেরা ছিল, তাদের ছেড়ে তো আমিও চলে এসেছি। আমি তো হাসি মুখে মেনে নিয়েছি সেটা। মৌন বলে, কীসের সাথে যে কী তুলনা করছ! সব মেয়েরাই ওরকম বাড়ি ছেড়ে আসে। হ্যাঁ আসে, তাই বলে কি মেয়েদের কষ্ট হয় না! স্মৃতি তারা করে বেড়ায় না! যুগযুগ ধরে মেয়েরা বিচ্ছেদ যন্ত্রণা কষ্ট সব সইবে? ছেলেদের সইতে হলেই দোষ! মৌন কথা বাড়ায় না। এসব ফালতু তর্কের সময় নেই ওর। ওর আছে টিভি পেপার অফিস অ্যাসোসিয়েশন। আর আমি! আমি সারাদিন বাড়িতে—। বৌদিকে আঁকড়ে ধরেছিলাম যেন। যেন আমার পরিবার দিদি সব। আমাদের নতুন বাড়ি, বৌদিদেরও। একসাথে যেন খেলাঘর বাঁধতে লেগেছিলাম। খেলাঘরই বটে। ঘর কি চিরন্তন হয়!

অফিস থেকে ফিরে এসেছিল মৌন। সুকান্তদা-রা ফ্ল্যাট কিনেছে কলকাতায়। মৌন-র কাছে এসেছিল লোন-এর জন্য। মৌনর কাছে কতজন আসে লোনের ব্যাপারে। ব্যাঙ্কে চাকরি করলে নিজেদের লোন নেওয়ারও অনেক স্কোপ থাকে। অথচ সেই সুযোগ হেলাফেলা করছে এভাবে, কোনও মানে হয়! বললাম আমরাও কিনি না গো একটা ফ্ল্যাট। সুকান্তদা-রাও কিনে ফেলল।

—আরে সুকান্ত তো বেসিক্যালি কলকাতারই ছেলে। ও তো কিনবেই, জানা কথা।

—শুধু তো সেটা নয়, সমস্ত সুযোগ সুবিধাই তো কলকাতায়। কী আছে এখানে! আর কেই বা আছে আমাদের! আমাদের এখানেও যা, কলকাতাও তা।

—নেই, সে তো তোমার জন্যই! ও পাড়াতে সব ছিল। বাড়ি বন্ধু প্রতিবেশী পরিচিত। তুমি এক যায়গা থেকে আরেক যায়গায় নেচে বেড়াবে আর আমিও তোমার সাথে নাচব! ভালোই মুরগি পেয়েছ আমাকে! এত রূঢ়ভাবে বলতে পারল মৌন! এত ওর জ্বালা! অথচ এ বাড়িতে আসার সময় তো কোনওদিন সেভাবে আপত্তি জানায় নি। বুঝতে পারছি যত দিন যাচ্ছে আমার প্রতি বিদ্বেষ ঘনীভূত হচ্ছে ওর মনে। আজকাল সবকিছুতেই অসহিষ্ণু। একেক সময় মনে হয় হাতুড়ি দিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিই এই বাড়ি। শখের এই বাড়িতে অশান্তির বীজ দিন দিন শেকড় বিস্তার করে চলেছে স্পষ্ট।

তুলিকে ভর্তি করেছিল কলকাতার কলেজে। বিনু বৌদিও চলে গেল ওখানে ফ্ল্যাট কিনে। তাপস দাদার চাকরি তখন বাকি সাত বছর। দাদা এখানেই থেকে গেল। বৌদি ছুটি হলেই চলে আসত। তারপর আস্তে আস্তে আসা কমে গেল। আমি তখন বিটুকে নিয়ে ছুটছি এক টিউশন থেকে আরেক টিউশন। আমার এদিক ওদিক তাকানোর সময় নেই। প্রথম যখন বৌদি চলে গেল তখন যেন হঠাৎ করে চারপাশ ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু প্রকৃতিতে শূন্যের স্থান নেই, এই তথ্যে টান মেরে নেমে পড়েছিলাম নিজস্ব ব্যস্ততার ঘূর্ণিতে। একে একে বয়ে গেল বছরগুলো কীভাবে যে, এখন ভাবলে মনে হয় ওই সাতবছর যেন একটা কমপ্রেসড মুহূর্ত। মনেই হচ্ছিল, এবার ওরা বাড়ি বিক্রি করে দেবে। বৌদি এসেছে এর মধ্যে যতবার, আমার আর কথা বলার সময় কই! সাত বছর, সাত বছর কেন আট বছর হয়ে গেল বাড়িটা লক্ষ্মীছাড়া। ছাদের গাছগুলো একটা দুটো করে মরতে মরতে সব শেষ। পরে আছে শুধু খালি টব মরা ঘাস। একবার দাদা ছাদে তোষক শুকোতে দিয়েছিল। আমাদের ছাদে তখন এক লেবার কী যেন কাজ করছে। বিড়ি খেয়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল তোষকের উপর। ভাগ্যিস সাথে সাথে তাপসদাদা দেখে ফেলে, এক জায়গায় অল্প একটু পুড়েছিল। ভীষণ বিড়ম্বিত হয়েছিলাম সেবার। নতুন তোষক কিনে দিতে চেয়েছিলাম। দাদা রাজি হয় নি। কিন্তু পরে বৌদি এসে বলেছিল, তোষকটা পুড়ে গেল। লজ্জায় তখন আমার মাটিতে মিশে যাওয়ার দশা। কিন্তু এখন ভাবি, বৌদি সেদিন কথাটা না শোনালেই পারত। আমার তো কিছু করার ছিল না, ওটা একটা ঘটনা। তবু আমি দায় স্বীকার করে তোষক কিনেও দিতে চেয়েছিলাম।

পায়ে একটা ঢিল আটকাল। ওঃহো। তুলে ওটাকে একপাশে ফেলে—। নাঃ এবার নিচে নামতে হবে। মৌন চলে আসবে এখনি। চলেও এলও। সন্ধ্যার কাজকর্ম বাঁধাগতে। মুড়িতে চানাচুর আর তেল, সঙ্গে শসা। দুধ চা চিনি কম। মৌনর চোখ টিভির পর্দায়। আমি পাশে বসে চা শেষ করি।

বললাম টিভিটা এখন না দেখলেই নয়!

—সারাদিন খবর শোনা হয় নি, একটু খবরটা দেখেই বন্ধ করে দেব।

—আর আমি যে সারাদিন একটাও লোক পাই নি কথা বলার!

—বল না কী কী বলার আছে!

—সত্যিই তো কী বলার আছে! কথা হাতড়াই আমি। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। চা অর্ধেক খাওয়ার পর বাকিটা প্রতিদিনের মত নষ্ট করে উঠে পড়ি। পূজার ছুটিতে বাড়ি এসে মোবাইল ফোনে ফেসবুক একাউন্ট খুলে দিয়েছিল বিটু। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলাম। কী যে ছাতা মাথা! একফোঁটাও ভাল লাগে না। এক প্রৌঢ়া তার মৃত মায়ের সামনে কাঁদতে কাঁদতে ছবি তুলেছে। উপরে স্ট্যাটাস, মা চলে গেল। আহা বেচারি, লাইকের ঢল নেমেছে। কমেন্ট খুলে দেখলাম, একজন লিখেছে, কেঁদ না। অন্যজন লিখেছে, কাকিমা খুব ভাল ছিলেন। বেশিরভাগই আর আই পি অথবা প্রণাম লিখে দায় সেরেছে। কেউ কেউ "খুব সুন্দর লাগছে" লিখতেও ভোলে নি। যত্তসব। বিরক্তিতে ছুঁড়ে ফেলতে

যাচ্ছিলাম মোবাইলটা। নোটিফিকেশন আসল, পাপড়ি চক্রবর্তী সেন্ড য়ু ফ্রেইন্ড রিকুয়েস্ট। নামটা চেনা চেনা লাগছে—। অ্যাকসেপ্ট করে প্রোফাইলটা খুললাম। মনে পড়ল, স্কুলে পড়ত। তেমন বন্ধুত্ব ছিল না। বরং—। মেসেজ ঢুকল। ক তো দি ইইইন তোকে দেখি না। কেএএএমন আছিস। কী আনন্দ যে হচ্ছে—

আমিও লিখলাম, ওমা তুই! কী আনন্দ হচ্ছে! কী মিথ্যা কথা। ঘোড়ার ডিম আনন্দ হচ্ছে। তবু প্রেমপ্রস্তাবগুলোর থেকে এটা ভালো। মেসেজবক্স ভর্তি প্রেম। প্রেমের সমুদ্রে হাবুডুবু। লাল নীল কত ছবি। সকালের শুভেচ্ছা বিকেলের গোধূলি পেরিয়ে রাতের নরম ঘুমের তেরো নদী। ভার্চুয়াল জগতের অমোঘ হাতছানি। আহা রূপকথা। রূপকথার ঘরবসত। তুলির মেসেজ। কাকিমা কেমন আছ! রিকু পাঠিয়েছি দেখো। মা তোমার কথা খুব বলে। কী ভালো গো ছিলে তুমি! মা বলে সেসব দিন ভোলা যায় না।

কবে পাঠিয়েছে রিকু! দেখি নি তো, এমা! তুলির প্রোফাইল খুললাম। কী সুন্দর হয়েছে যেন মডেলিং করছে। এই তো বিনু বৌদি। বৌদিকেও ভাল লাগছে। সব ভাল। কোনও খারাপ ছিল না। যা ছিল সেসব আমি মনে রাখতেও চাই না মোটে। একবার কাজের ঝি আমার বাড়ি আগে কাজ করতে ঢোকায় বৌদি খুব মুখ করেছিল। জানত আমি শুনছি তবু পরোয়া করে নি। এমন ছোটখাটো ঘটনা আমি ছুঁড়ে ফেলেছি বহুকাল আগে। ওসব মনে রাখলে এতদিন আর ভাল সম্পর্ক রাখা যেত না। একদিন বিট্টু তখন অনেক ছোট, ওকে রেখে একটা জরুরি কাজে যেতে চেয়েছিলাম। বৌদি রাখতে রাজি হয় নি। বলেছিল সেও বেরবে। তাতে কী, নিশ্চয় পরিস্থিতি তেমনই ছিল! আমার তখনকার মত খারাপ লেগেছিল অবশ্য।

লেপ নিয়ে ছাদে উঠলাম। বেশ শীত পড়েছে। প্রায় বারোটা বাজে। এখন সবে মাত্র রোদ উঠল। নাঃ এখন আর রোজ ছাদে ওঠা হয় না। কী জানি কেন সময়ই তো হয় না। সময় হলে লেপের তলে বিছানা।

আজ ছাদে উঠেই চোখে পড়ল নিলয়বাবুদের বাড়ির সামনে সাদা টগর ফুলের গাছটা কাটা। এটা আবার কবে কাটল! মনটা কেমন হু হু করে উঠল।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মনটা এমনই হু হু করে উঠেছিল অকারণ। একটু পরেই বিনু বৌদির গলা পেলাম। ও মা তুমি কবে এলে!

—এই তো আজই সকালে।

—সে কি, সারাদিন সারা শব্দ পেলাম না তো!

—আছ বাড়িতে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ আছি, এসো না।

একটু পরে এসেছিল তাপস দাদা আর বিনু বৌদি। বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। কাল বিকেলের ট্রেনে চলে যাচ্ছে। সকালে ট্রান্সপোর্ট-এ জিনিসপত্র চলে যাবে।

—সেকি! জানলাম না তো কিছু! এই তো সেদিনও তো দাদা বলল, বাড়ি বিক্রি করবে না।

—হ্যাঁ তেমনই ইচ্ছা ছিল কিন্তু—।

যাকগে যাক, তা একদিকে ভালোই হয়েছে। সবাই যখন কলকাতায় তখন এখানে আর শুধু শুধু বাড়ি ফেলে রেখে কী হবে! কাল আমাদের বাড়িতে খেও। প্রসঙ্গ পালটে বলেছিলাম আমি।

—না না তোমাকে ওসব ঝামেলা করতে হবে না। আমি কিছু একটা করে নেব।

জানতামই ওরা চলে যাবে। দাদা রিটায়ার করার পর ইদানিং থাকতও তো না আর। তবু সন্ধের বুক হু হুটা যেন সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলল আমাকে। অদ্ভুত একটা কষ্টবোধ। সাত সাতটা বছর কমপ্রেসড হয়ে ভ্যানিস। বার বার মনে পড়ছে একসাথে বাজার যাওয়া, কাজের লোক খোঁজা অথবা অসুস্থ মৌনকে সেবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া। বিনু বৌদির শাশুড়ি মারা যাওয়ার সময় আমি যা করেছিলাম ওরাও বারবার সেটা আওড়াচ্ছিল। কত কথা, সতেরো বছরের স্মৃতি এক সন্ধ্যায় কি তার পুনরাবৃত্তি সম্ভব! দুদিনেও সম্ভব নয়। গ্রীষ্মের রোদ মুখে পড়ছিল। তবু ছাদে দাঁড়িয়ে স্মৃতির ডালি খুলে বসেছিল বৌদি। কাঁদছিলাম আমরা দুই প্রতিবেশিনী। পরে আমি গিয়েছিলাম যখন খাঁ খাঁ করছিল ঘর। আমি রান্না করে থালায় সাজিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। শূন্য ঘরে বৌদি তাকিয়েছিল দেওয়ালের দিকে। ফ্যান খুলে নিয়ে গেছে। জানলা দিয়ে হাওয়া ঢুকছিল। বলল কলকাতায় এমন হাওয়া আর পাব না। ঘুপচি ফ্ল্যাট। আমার তো একটুও পছন্দ না। নিজের হাতে করা এমন খোলামেলা বাড়ি ছেড়ে—। পাড়ার কতজন কতদিন আমাদের দুই জা ভেবেছে। বিকেলে সকলেই এসেছিল। যারা বাড়ি কিনেছে নিলয়দা আর বনিও। দাদা বলল, এই টগর গাছটা যেন কেটে ফেলবেন না। আকুতিটা আমার বুকে গিয়ে যেন ডুব মেরেছিল। আমি জানি আমার ছোটবেলার বাড়িতে সেই শিউলি গাছটাকে ছেড়ে আসার ব্যাথা। জানি সেই পুকুরের ধারের পাখিগুলোর না ভোলা ডাক। জানি সেই ঢোঁড়া সাপের জল চলা। জানি কোন যন্ত্রণায় মৌন আজও আমাকে ক্ষমা করতে পারে না। আমি জানি টগর গাছের এই ছোট্ট চারা গাছটাকে বাঁচিয়ে তোলার গল্প। আমি জানি এই বাড়ির প্রতিটি ইঁটের গড়ে ওঠার পুঙ্খানুপুঙ্খ। আমাদের বাড়ি আর ওদের বাড়ি যে একসাথেই জন্ম নিয়েছিল একসাথেই বেড়ে উঠেছিল। তাই আমি জানি বাড়িটির পর্দা কেনার দাম দর। জানি জানি সব জানি, সব। কিন্তু সেসব ধারণ করা বড় কষ্টের। ভীষণ করুণার। ওরা চলে গেল।

দশদিন পর রথ। গৃহপ্রবেশ করেছিল নিলয়বাবুরা। খুব আদর সম্মান করেছিল আমাদের। অনুষ্ঠানের দিন তার পরের দিনও খাওয়ালো। এল ই ডি টিভি কেনার পর ডেকে নিয়ে গিয়েছিল দেখতে। বাড়িটা তিয়া সিয়ার আওয়াজে যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। বনির বকুনিতে জেগে উঠেছে। দেড় বছর হল। কত গাছ যে লাগিয়েছে ছাদে! ওরা চারজন মিলে গাছের পরিচর্চা করে। রাতে হলুদ আলোয় কী প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে যে! কখনও কখনও আড়াল থেকে দেখি ওদের পারিবারিক যাপন। কী সুখ কী সুখ।

টগর ফুলের গাছটা কেটে ফেলেছে।

কিছু বলার নেই। তবে ছাদের দিকে তাকিয়ে মন ভরে গেল। ফুলে ফুলে বাহারি। বিনু বৌদিরাও গাছ লাগাত, আমিও লাগাই কিন্তু অদ্ভুত রুচি আর সকলে মিলে একসাথে করা পরিশ্রমের মিলমিশে যে রঙিন পৃথিবী গড়ে তুলেছে নিলয়বাবুরা তা এককথায় অনবদ্য।

নিচে নেমে সিঁড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিছুতেই ঘরে ঢুকতে পারছি না। ঘব ময় ফরফর করে উড়ে বেরাচ্ছে মিশকালো রঙের একটা বিশাল চামচিকা। আমি সাপ দেখলেও অত ভয় পাই না এমনকি ভুত দেখলেও না কিন্তু সাক্ষাৎ ড্রাকুলার আত্মীয়! উহহ। জানি না ড্রাকুলা চামচিকা না বাদুড়ের আত্মীয়। এমন কি চামচিকা বাদুড় আর ড্রাকুলার জাত প্রজাত বিচার করারও প্রয়োজন নেই আমার। আমি শুধু ওই কালো প্রাণীটা থেকে দূরে থাকতে চাই। মৌন কখন আসবে! উহহ কোথা দিয়ে যে ঢুকল, বেরোয়ও না। সিঁড়ির কাছে ঘরের দরজাটা খুলে একবার ভয়ে ভয়ে উঁকি দিলাম। দেখছি না তো! বেরিয়ে গেছে! ওরে বাবা কোথায় গেছে! এ তো পর্দার পেছনে ঘাপটি মেরে বসে আছে। যেন আমি ঢুকলেই—। ঘর ডাইনিং আবার ফর ফর ফর ফর। এভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব! সিঁড়িতে বসে পড়লাম। গালে হাত দিয়ে বসে আছি তো আছি। আবার উঁকি দিলাম। ঠিক দরজার উপরে নিচের দিকে মুখ ঝুলিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অপেক্ষা করছে শিকারের। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর মৌন এলো

—উহহ এত দেরি কেন আজ!

— কেন, কী হয়েছে!

ঝাঁঝিয়ে উঠলাম আমি, কী হয়েছে! সেই কখন থেকে বাইরে বসে আছি। ঘরে চামচিকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা কিছু হলে ডাকার মত কেউ আছে! কবে থেকে বলছি এই নির্জনপুরিতে থাকতে ভাল লাগছে না। চল চলে যাই ফ্ল্যাট—।

কথা শেষ হল না।

ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট আর ফ্ল্যাট! পাগল করে দিল! কে নিষেধ করেছে! যাও না যেখানে খুশি একটা কেন পাঁচটা ফ্ল্যাট কিনে ফেল। হাট বসাও, হাটের মধ্যে গিয়ে থাক, অথবা কোথায় তোমার প্রিয় মানুষজন আছে, সেখানে যাও। আমাকে রেহাই দাও। হাতজোড় করছি।

হঠাৎ ঈগলের মত থাবা বাড়িয়ে ঘাড় চেপে ধরল আমার। বলল, কচুরিপানার মত ভেসে বেরানো নয়, শান্তিতে থাকার জন্য একটা মাটি লাগে তবে শেকড় গভীরে যায় কোমরে শক্তি বাড়ে।

প্রাথমিক হতবাক দশা কেটে যেতেই আবার মুখে কথা ফুটল আমার। বললাম, যত সব সেকেলে ধ্যান ধারণা। সাত পুরুষের বাড়ি গুঁড়িয়ে চারিদিকে আধুনিক বিল্ডিং উঠে যাচ্ছে, হাইরাইজ আর উনি সেই—।

কিছুক্ষণ হিংস্রভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল মৌন যেন এক্ষুনি ছিঁড়ে ফেলবে আমাকে তারপর ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে প্রায় ছুঁড়ে ফেলল।

—আমার বাড়িতে তোমাকে আর দয়া করে থাকতে হবে না, আমাকে আমার মত শান্তিতে থাকতে দাও।

—এতো বড় কথাটা বলতে পারলে মুখ ফুটে! তোমার বাড়ি এটা! আর আমার বাড়ি!

চোখে জল চলে এসেছিল।

—অপদার্থ!

মৌন ঘরে ঢুকে অফিসের ব্যাগটা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দিতে বলেছিল।

একটা লাঠি নিয়ে উড়ন্ত চামচিকা লক্ষ্য করে মারল এক বাড়ি। নির্ভুল লক্ষ্য। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল ওটা। মুখ দিয়ে গলগল করে এক খাবলা রক্ত বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। শিউরে উঠেছিলাম আমি। বিবমিষায় —উহহ।

এই ঘৃণা এই আঘাত আমার সব ঘুম কেড়ে নিয়েছে। বুকের মধ্যে হাঁটু গুঁজে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছি আমি আমার শেকড়।

কবির কলমে

চশমখোরের চশমা

শুক্লা রায়

প্রচন্ড গরমে ঘামতে ঘামতে চোখ পুরো ঝাপসা। না, চোখ মোটেই ঘামছে না, ঘামছে আমার চশমার কাচ। সব থেকে বড় অশান্তির ব্যাপার হল প্রতি সেকেন্ডে চোখ থেকে নেমে যাওয়া চশমার সাথে বাঁদরের তেল মাখানো লাঠিতে চড়ার গল্পের খুব মিল পাচ্ছি। এই বিরক্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে বাঁ হাতে চশমাটা ধরে ডান হাতে ল্যাপটপের মাউস এবং কী বোর্ড সামলাচ্ছি। বেচারা ডান হাত! কী বোর্ড আর মাউসের মাঝখানে যুদ্ধ করছে। তখন কী আর ভেবেছিলাম, সেই সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময়! একটা চশমার জন্য কী না করেছি! যেভাবে দিনগুলো পেরোয়, ভালোই কাটছিল। সমস্যা হল অনিমেষের জন্য। হঠাৎ একদিন ক্লাসশুদ্ধ লক্ষ্য করলাম অনিমেষ বেশ সুন্দর দেখতে একটা চশমা পরে স্কুলে এসেছে। প্রথমে আমাদের নিজেদের মধ্যে একটা গুঞ্জন, তারপর ওকে বিভিন্ন প্রশ্নবাণে ব্যস্ত করে তুললাম। নতুন চশমা পরার আনন্দে সে বেশ হাসিমুখেই সব প্রশ্নের উত্তর দিল। কোন ডাক্তারবাবু, পাওয়ার আছে তো, এবং পাওয়ার না থাকলে যে স্যারের কাছে উত্তম-মধ্যম খেতে হবে সে সম্পর্কে সতর্কবাণী কোনও কিছুই বাদ গেল না। একজন বুঝুক না বুঝুক এও জানতে চাইল "পাওয়ার কত রে?" অনিমেষ কী একটা জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ না কী যেন বলে দিল। আমরা হাঁ করে শুনলাম। সেই মুহূর্তে ভুলে গেলাম ছাত্র হিসেবে অনিমেষ খুবই খারাপ, কোনও পড়াই মনে রাখতে পারে না। আমরা গাঁইয়া গোবিন্দরা এই পাওয়ারের মানে আর হিসেব আসলে কিছুই বুঝলাম না। সেজন্য সমীহ তো হবেই! কিন্তু সেটা আবার প্রকাশ্যে স্বীকার করে নেওয়াটাও খুব কঠিন।

স্যার এলেন, আমরা যে যার জায়গায় বসলাম। একদম ঠিক, অনিমেষকে দেখে স্যারও একটা বিরাট ধাক্কা খেলেন। "কী রে চোখে চশমা কেন? ডাক্তার দেখিয়েছিস?" বিজ্ঞ অনিমেষ গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। স্যার আর কিছু বললেন না। রোল কল শুরু করলেন। আমাদের হয়ে গেল মনখারাপ। স্যার কী একটা কিছু বলতে পারতেন না! নিশ্চই পারতেন। আমাদের বোকা বানানো সহজ হলেও স্যারকে নিশ্চই যেত না। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্য করলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টটি আমাদের ক্লাসে বসে আছে। মুখখানাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করে পড়া শুনছে। মাঝে মাঝে স্টাইল করে আঙুলের ডগা দিয়ে চশমা ঠিক করে নিচ্ছে। যেন মা সরস্বতীর বরপুত্র বসে আছেন! এমনিতেই তখন স্কুল ড্রেস ছিল অতি সাধারণ। মেয়েদের সাদা ফ্রক অথবা সাদা মিডি, ছেলেদের সাদা শার্ট কালো প্যান্ট। আমাদের সেই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের জীবনে চোখে পড়ার মত শুধু অনিমেষের চশমাটাই ছিল। সেটা অনিমেষ নিজেও জানত। ওর দেমাক আর হাবভাব আমাদের ঈর্ষা জাগানোর পক্ষে যথেষ্ট। ক্লাসে রাহুল ছিল এক নম্বরের হাড় বজ্জাত ছেলে। কাউকে তোয়াক্কা করে না। স্যাররাও মনে হয় মনে মনে ওকে সমঝে চলেন। সে পর্যন্ত একদিন লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলে ফেলল, "অনিমেষ, দে তো রে একটু চশমাটা, পরে দেখি"। ঈশ্বর জানেন, এটা আমাদের প্রায় সবারই সুপ্ত ইচ্ছা, শুধু মুখ ফুটে বলা যাচ্ছিল না। কিন্তু অনিমেষ একেবারেই না করে দিল। কী— না একজনের চশমা অন্যজন পরতে পারবে না, তাহলেই চোখ খারাপ হবে। আসলে পরতে দেওয়া তো দূরের কথা, হাত দিয়ে একটু ছুঁতেও দিতে চায় না। আড়ালে ওর নাম রাখা হল

অনিমেষকে দেখে বুঝতে পারলাম, চোখ খারাপ হওয়াটাও কত গর্বের! কত অহংকারের! কত সাধের! মনে হচ্ছিল এবার পুজোয় নতুন জামা কেনার দরকার নেই, একটা চশমাই নিই। কিন্তু উপায়? আমার ভয়ঙ্কর মা কে একথা বোঝানোই মুস্কিল যে চশমা কত দরকারি একটা জিনিস!

চশমখোর। রাগে অপমানে রাহুল বিনা বাক্য ব্যয়ে অনিমেষের মাথায় একটা জোর গাঁট্টা মেরে মাঠের দিকে হাঁটা দিল। আমরাও আর দাঁড়ালাম না। এখন অনিমেষ কাঁদবে কিন্তু আবার মার খাওয়ার ভয়ে নালিশ করতে যেতেও পারবে না। ওকে সহানুভূতি দেখানোর কোনও প্রশ্নই নেই। আমরা যে যার মত ব্যস্ত হয়ে গেলাম।

মায়ের কাছে শুনে শুনে এতদিন ধারণা ছিল চোখ খারাপ হওয়াটা একটা ভয়ঙ্কর খারাপ ব্যাপার। সন্ধ্যার মুখে আলো কমে আসার পরেও হয়ত একটু গল্পের বইয়ে মুখ ডুবিয়ে আছি, মা চীৎকার করতেন—"অন্ধকারে পড়িস না, চোখ খারাপ হবে, কিছুদিন পরে পড়া তো দূরের কথা কিছু দেখতে পাবি না"। খেতে বসিয়ে দিয়ে বলবেন শাক খা নইলে রাতকানা হবে। সবসময়ই যেটা শুনতে হয় সেটা হল—"সারাক্ষণ জুতো পায়ে দিয়ে ঘুরছিস, খালি পায়ে হাঁট একটু, চোখ খারাপ হবে তখন বুঝতে পারবি, কিছু দেখতে পাবি না"। এই 'কিছু দেখতে পাবি না'র ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতাম। সত্যি তো, যদি অন্ধ হয়ে যাই! চোখ বন্ধ করে হাঁটার চেষ্টা করে সুবিধা করতে পারি নি। সেজন্য চোখ নষ্ট হওয়ার ভয়ে মায়ের ঘ্যানঘ্যানে নির্দেশগুলো মেনে চলতেই অভ্যস্ত ছিলাম। তাছাড়া অনিল কাকার চশমাটাও কেমন বিতিকিচ্ছিরি ছিল। প্রতিদিন সকালে অনিল কাকা আমাদের বাড়িতে পেপার পড়তে আসতেন। চোখে মোটা কাঁচের চশমা, কালো ডাঁটির একদিকটায় নেই, দড়ি দিয়ে বাঁধা। কাকাকে কখনও বাবার ছোট বলে মনেই হত না। খুব অবাক লাগত। একদিন প্রশ্নটা করেই ফেললাম, মা-ও বলতে শুরু করেছিলেন, "অনিল কী আর এরকমই ছিল রে, ওই ঘটনার পর থেকেই তো ওর শরীরটা ভেঙ্গে গেল।" কিন্তু কোন ঘটনা? মা ধমক দিয়ে বললেন "সক্কালবেলা, পড়াশুনা নেই, বড়দের মুখে মুখে গল্প শোনা?" এরপর আর প্রশ্ন চলে না। সেই অনিল কাকা বলতেন চশমাটা সূর্যের দিকে ধরে নীচে কোনও কাগজের উপর সূর্যরশ্মিটাকে ফেললে কাগজে আগুন ধরে যাবে। কিন্তু মা কখনও সে চশমায় হাত দিতে দেন নি। তাই পরীক্ষা করাটা আর হয়ে ওঠেনি। তবে লক্ষ্য করেছি অমন শক্তিশালী চশমাতেও কাকা খুব কষ্ট করে দেখতেন। চশমার ভেতরে বৃদ্ধ চোখ দুটো কেমন কুঁচকে উঠত। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চেনা মুখটিকে চিনতে পেরে অবশেষে খুব খুশি হতেন। মায়ের সেই "কিছু দেখতে পাবি না" বললে এই ছবিটাই চোখে ভাসত। রজতের ঠাকুমার চোখ অপারেশনের পর অদ্ভুত একটা কালো চশমা পরতেন। ওটা দিয়ে কিছুই কী দেখা যায়? ঠাকুমাকে বারবার জিজ্ঞেস করলে খুব রেগে যেতেন। বাবার সঙ্গে জটেশ্বর হাটে এক তামাকের দোকানিকে দেখেছিলাম দুই চোখের একদিকে চশমা অন্যদিকে কালো ঢাকা। হাত দিয়ে নিজের একটা চোখ ঢেকে পরীক্ষা করে দেখলাম জিনিসটা মোটেও সুবিধার নয়। সুতরাং এ হেন চশমার খপ্পরে পড়ার কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না।

কিন্তু অনিমেষকে দেখে বুঝতে পারলাম, চোখ খারাপ হওয়াটাও কত গর্বের! কত অহংকারের! কত সাধের! মনে হচ্ছিল এবার পুজোয় নতুন জামা কেনার দরকার নেই, একটা চশমাই নিই। কিন্তু উপায়? আমার ভয়ঙ্কর মা কে একথা বোঝানোই মুস্কিল যে চশমা কত দরকারি একটা জিনিস! ক্লাসে ইতিমধ্যে দু-একটা ছোট-খাট কিন্তু সিরিয়াস ঘটনা ঘটেই গেল। নমিতা পর পর দু'দিন রাগে-দুঃখে উপোস করেও চশমা আদায় করতে পারল না। ভাস্কর বলে দিয়েছিল চশমা না দিলে পড়াশুনা ছেড়ে দেবে, ওর বাবা সব বই-পত্র রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল, ওর মা কুড়িয়ে এনেছেন। আবুল বেচারা মা, বাবা কাউকে না, নরম সরম দেখে দাদুর কাছে একটা চশমার আবদার করেছিল। ওর মা শুনতে পেয়ে বলে দিয়েছেন ফ্যাশন করতে হলে স্কুলে কেন বোম্বে যা, আমারও শান্তি হয়।

এসব দুর্ঘটনার খবর শুনে আমার আর সাহসে কুলোচ্ছে না। কিন্তু নিজেকে সামলানোও যাচ্ছে না। যে করেই হোক চশমা একটা নিতে ইচ্ছে করছিল। অনিমেষের সঙ্গে একটু ভাব করে চশমার খুঁটিনাটি জানা গেল। মাথাবাথা করছিল, ডাক্তারবাবু চশমা দিয়েছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই আমারও পড়তে বসলেই মাথাব্যথা শুরু হল। মায়ের বক্তব্য পরিষ্কার, 'ওসব না পড়ার অজুহাত”। বাবা একটু নরম গোছের সাধাসিধা মানুষ, বললেন “আজকাল সবকিছুতেই যা ভেজাল! চোখটা একটু দেখিয়ে নেওয়াই ভাল। কিন্তু মাকে কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না। ভেজাল-টেজাল কিচ্ছু না, ভাষণ দিলেন আমি শাক খাই না, ডাল তো পাতেই নিই না,গল্পের বই একবার হাতে পেলে অন্ধকার হয়ে গেলেও ছাড়ি না ইত্যাদি। আর সবচেয়ে বড় দোষ তো সারাক্ষণ জুতো পায়ে ঘুরে বেড়ানো! শরীরের সঙ্গে মাটির যোগাযোগ হচ্ছে না, চোখ তো খারাপ হবেই।

তবু শেষ পর্যন্ত অনুমতি পেলাম, বাবার সাইকেলে চেপে পরের রবিবার ধূপগুড়িতে চোখের ডাক্তার দেখাতে এলাম। নাম লেখানোর পর অপেক্ষা, আমার আর ধৈর্য থাকছে না, ছটফট করছি। অবশেষে ডাক এল। ডাক্তারবাবু খুব মন দিয়ে দেখছেন, আমার বুক টিপ টিপ করছে। কিন্তু আশঙ্কাই সত্যি হল। চোখে কোনও সমস্যাই নেই। ব্যাজার মুখে বেরিয়ে এলাম। দোকানে মিষ্টি আর বনরুটি খেয়ে আবার সাইকেলে ফেরার পথ। কিন্তু মা কিছুতেই মানতে রাজি নন। চোখে সমস্যা একটা হতেই পারে। নিদান দিলেন ভোরবেলা খালি পায়ে ঘাসের উপর হাঁটতে হবে। তাতে চোখ ভাল থাকে। পরপর কয়েকদিন টানা ভোরে উঠে খালি পায়ে ঘাসের উপর হাঁটার পর চশমার শখ এমনিতেই ঘাড় থেকে নেমেছে। সেই আমিই এখন চশমা চোখে ওঠাতে বুঝতে পারছি জিনিসটা মোটেও সুবিধার নয়। আমার বাবা- মা যেখানে যাটের কাছাকাছি বয়সে এসে চশমা নিয়েছেন সেখানে আমার এখনই এই অবস্থা! চল্লিশে চালশে।

'এখন ডুয়ার্স'
দ্বারা প্রকাশিত সবরকম
বই পাওয়ার ঠিকানা
শিবমন্দির

অনুপ কুমার দাস
৯৫৬৪৯৯৮৫৬১

কাশ ঝরে যায়

ডুয়ার্সের মেয়েবেলা

অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

ছুটি শব্দের মধ্যে যে ছুটে যাওয়ার একটা আবহ, সেটা প্রিয় নয় এমন মানুষ কি হয়? এই ক্লান্ত মধ্যবিত্ত কাজের দমচাপা পৃথিবীতে ছুটি তো একটা মুক্তি, একটা উড়ান, একটা ডানাও। আর সে যদি হয় একটা দীর্ঘ অবকাশের পাসপোর্ট তবে তার প্রতি আখরে সাজানো অজস্র রঙিন চকমকি। সামান্য ঠোকাঠুকিতেই ফুলঝুরি ওঠে আকাশ ছোঁয়া। পুজোর ছুটি নিয়ে সারা বছরের যে পরিকল্পনা বাঙালির শুরু হয় নতুন বছরের ক্যালেন্ডারখানা হাতে পেয়েই, তার তুলনা সারা পৃথিবীতেই মেলা ভার। স্থান কাল সময় ব্যক্তি বিশেষে পুজোর ছুটির আবহ ও স্মৃতির ভাঁড়ার কিছু কিছু আলাদা হলেও কোথাও একটা সাধারণ যোগসূত্র যেন রয়ে যায়। তার কারণ পুজোর ছুটির সময়টা শরতকাল, যে শরতে নিভৃত নীল পদ্ম ফোটে বাঙালির বুকের গভীরে। অজস্র উপকরণ সাজিয়ে উৎসবের দিন গুঁড়ো গুঁড়ো রোদ্দুর ছড়িয়ে দেয় হৃদয়ের কার্নিশে। এখন পুজোর ছুটি মানে চারপাশে ভ্রমণসঙ্গীত বেজে ওঠার আয়োজন ঘরে ঘরে। সাধ আর সাধ্যের মেলবন্ধন সার্থক করে ঘরকুনো বাঙালির অপবাদ দূর করে গৃহস্থের দীঘা পুরী দার্জিলিং বা কেরল জয়পুর কুলু মানালি হয়ে এখন ব্যাংকক পটায়ার পথে মসৃণ উড়ানের দিন। এমন চমৎকার পরিবেশ আর অবকাশ আর কোন সময়েই বা!

আজ থেকে দু'দশক আগের পুজোর ছুটির স্মৃতি রোমন্থন করতে বসে সোনালি ঝকঝকে যে দিনগুলো আজও বিবর্ণ না হওয়া গোপন এ্যালবাম থেকে উঁকি মারে সেখানে অনেক খুশির প্রজাপতির ঝলমলে উড়ে যাওয়া একটা বিরাট বড় সাবেকি দোতলা বাড়ির ছড়ানো উঠোনের চারপাশে রেণু রেণু আলোয়, যে আলোটার রঙ ছুটির কয়েকদিন আগে থেকেই নরম হতে শুরু করেছে সকালের দিকে। আর বেলা বাড়ার সঙ্গে নত হতে হতে আমগাছটার মাথায় কিরকম একটু মনকেমন করা আগমনী রেখে মিলিয়ে যাচ্ছে। শুধু তো নিজেদেরই না, মায়েরও যে ছুটি থাকবে ক'টা দিন আর কড়া রাগী হেডমিস্ট্রেস মা সারা ছুটিটা সাধারণ করে পাটভাঙা শাড়ি পরে, কপালে বড় একটা লাল সিঁদুরের সূর্য এঁকে লোভনীয় সব রান্নার আয়োজন সাজাবে বড় বড় কাঁসার থালার চারপাশ ঘিরে ওঠা একডজন বাটিতে। নিজে হাতে খাইয়ে দেবে তিন বোনকে এক থালায় ভাত মেখে আর পুজোসংখ্যায় সুন্দর করে মলাট লাগিয়ে পড়া শেখাবে। বোনেদের মারামারি আটকাতে মাদুরে শুয়ে ওই তো কাকাবাবু পড়ছেন মা আর আমরা তিন বোন বেড়ালছানার মত মায়ের বুকে পেটে কাঁধে মাথা মুখ গুঁজে শুনছি।

ছুটিতে একটা নির্দিষ্ট রুটিন থাকত আমাদের। পড়াশোনা আর অন্য কাজের। কিন্তু সেই রুটিনটা এতটাই বাঁধনহীন উপভোগের যে সারাবছরের অপেক্ষা ঘিরে ঘন হয়ে থাকত ক'টাদিনের জন্য। আমাদের ঘরকুনো বাবা খুব বেশি বেড়াতে যেতে চাইতেন না এই ছুটিতে তার একটা কারণ নিজেদের দেশের বাড়ির পুজো। শরতের অকৃপণ উজাড় করা দাক্ষিণ্য সমস্ত শরীর মন জুড়ে মেখে নিয়ে পুজো পুজো গন্ধে নাক ডুবিয়ে সারা শরীর মন জুড়ে উৎসবে ভরপুর আমরা সপরিবার যেতাম দেশের বাড়ির পুজোয় অষ্টমীর সকালে। ফিরেও আসতাম নবমীতে। কাঁচা সোনার মত রঙের সে একচালার দুর্গা প্রতিমার রূপ সারা পৃথিবীতে কখনও নকল করা সম্ভব না বোধহয়। নিজেদের বসত বাড়ির পাশের মন্ডপে সেই কবে থেকে প্যান্ডেল বাঁধা শুরু! তারপর সারারাত ধরে হ্যাজাকের আলোয় মায়ের চক্ষুদান! সেজে ওঠা ঘামতেলের স্বেদবিন্দুর দানা চিবুকে নাকের পাটায়। পুজোর ছুটি মানেই তাই ধুনোর গন্ধ আর ঢাকের কাঠির সঙ্গতে একটা অলৌকিক সময়ের অনন্ত হয়ে থাকা। বিজয়া দশমীর পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাড়ায় পাড়ায়। মা-কাকিমাদের সারা বছরের ক্লান্তি আর একঘেয়েমি ভুলে এলোচুলে হাতখোঁপায় আর তাঁতের শাড়ির আটপৌরে আদরে জগজ্জননী হয়ে ওঠা! কত শিউলি কুড়নো ভোরে সদ্য কিশোরবেলার কত রোমাঞ্চ, শিহরণ আর সম্পর্কের ভাঙা-গড়া। বড় দামী মনে হত সেইসব সামান্য উপাদান। কালীপুজোর সময় অবশ্যম্ভাবী হিমে ভিজে গলা ব্যথা, হালকা জ্বর আর মায়ের বকুনি— স্কুল খোলার সময় ঘনিয়ে আসার মুখে দুধ-পাঁউরুটি আর লাল মিক্সচারের কড়া রুটিন।

পুজোর ছুটি এখন অনেক বেশি হাঁপ ছাড়ার— এই প্রতিদিনের কর্মব্যস্ততা থেকে, ডেইলি প্যাসেঞ্জারির ধকলের একঘেয়ে বিরক্তিকর জীবন থেকে দু-দন্ড শান্তি এই ভেবেই খুব গভীরে একটা লম্বা শ্বাস অনেকটা বাতাস ভরে দেয় ফুসফুসে। সময়সুযোগমত বেরিয়ে পড়ার অবকাশও বটেই। ছুটির আগে থেকেই প্রতিবারে তাই তালিকা বানানো না-পড়ে ফেলা বইগুলো পড়ে ফেলার, না-গোছানো লেখাপত্র সাজিয়ে তোলার। জানি, ছুটির শেষে দেখব এসবের অধিকাংশই করে ওঠা হল না এবছরও। শূন্য বাড়ি আঁকড়ে দূরে পরে থাকা আমার একলা মায়ের শূন্যতায় শুধু আরও কিছু সাদা রঙ লাগল কাশফুলের, আরও কিছু শিউলি জমল আমার স্মৃতিতে যার গায়ে এখনও ছোটবেলার পুজোর গন্ধ।

সরমা ঃ মহাকাব্যে উপেক্ষিতা এক নারী

শাঁওলি দে

মহাকাব্য মানেই ছোটবড় অসংখ্য চরিত্র, ঘটনার ঘনঘটা, গল্পের ভেতর আরও অসংখ্য গল্প। সেই সব চরিত্র কিম্বা ঘটনা যে সব সময় সমান গুরুত্ব পায় তাও নয়, তবু একটা মহাকাব্য গড়তে এদের প্রত্যেকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মহাভারতে যেমন অসংখ্য চরিত্র, প্লট-সাব প্লটের ছড়াছড়ি, রামায়ণও তার চাইতে পিছিয়ে নেই। বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের আড়ালে তাই ঢাকা পড়ে যায় অনেকেই। মহাকাব্য রামায়ণের এমনই এক চরিত্রের কথা এই সংখ্যায় রইল।

রামায়ণের এক অতীব সুন্দর চরিত্র হল সরমা, যিনি ছিলেন বিভীষণের পত্নী। তবে কেন জানি না প্রথম থেকে বাল্মিকী সরমাকে উপেক্ষাই করে গেলেন তাঁর কাব্যে। সমগ্র মহাকাব্যে তেমনভাবে বিকাশের সুযোগই পেলেন না সরমা। অথচ সরমার ঔদার্য্য ও ত্যাগ সত্যিই দৃষ্টান্তস্বরূপ। সরমা ছিলেন গন্ধর্বরাজ শৈলুষের কন্যা। জন্মের সময় মানস সরোবরে জলস্ফীতি ঘটে, সেই সময় ওঁর মা কাঁদতে কাঁদতে বলে ওঠেন, "সরোবর, তুমি স্ফীত হয়ো না"। সেই জন্য মেয়ের নাম হল সরমা। পরবর্তীকালে রাবণের ছোটভাই বিভীষণের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিভীষণের যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে উঠেছিলেন সরমা।

রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে অশোক বনে রাখেন, তখন সরমাকেই ডেকে পাঠান এবং সীতার দেখাশোনার দায়িত্ব দেন। এখানেই আমরা প্রথম সরমার দেখা পাই। সরমা স্বামীর বড় ভাইয়ের আদেশ অমান্য করতে পারেন নি, তিনি সীতার দেখাশোনার ভার নিজে হাতে তুলে নেন। এদিকে ওই সময় বিভীষণও নিজের দাদাকে ত্যাগ করে রামের কাছে গিয়ে থাকতে শুরু করেছিলেন স্ত্রী-পুত্র ছাড়াই, এতে নিজের স্ত্রীর প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল তা টের পাওয়া যায়। আবার রাবণও সরমাকে বিশ্বাস করতেন, নইলে সীতার ভার ভ্রাতৃবধূর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না।

স্বামী শত্রুপক্ষে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও সরমা প্রথম থেকেই সীতার দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, এর থেকে তাঁর সাহসিকতারও পরিচয় পাওয়া যায়। নিঃসঙ্গ সীতার জীবনে সেই অচেনা অজানা অশোক বনে সরমাই ছিলেন তাঁর একমাত্র সহায় ও সম্বল। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন সীতা সাধ্বী, তাই ওঁর সঙ্গে থাকলে সরমারও কোনও অকল্যাণ হবে না।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে যখন হনুমান লেজে আগুন লাগিয়ে সারা লঙ্কা পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছিলেন, সীতা ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন হনুমানের জীবন নিয়ে। তখন এই সরমাই আশ্বস্ত করেন সীতাকে, "হনুমান নাহি পোড়ে আছে সে কুশলে"। সীতাকে বশে আনার জন্য রাবণ নানা ছল কপটের আশ্রয় নিয়েছিলেন। একবার রামের ছিন্ন মস্তক এনে সীতাকে দেখালে সীতা শোকাতুর হয়ে ওঠেন। ততদিনে সীতা হয়ে উঠেছেন তাঁর সখী। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, রামকে বধ করা অসম্ভব। তিনি যদি নিদ্রিতও থাকেন, তবে তাঁর সৈন্যদল কিম্বা হনুমানদের পরাজিত করা এই প্রবল শক্তিশালী, বীর, অহংকারী রাবণের পক্ষে অসম্ভব। তিনি রাম ও লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ জানিয়ে শান্ত করেন বৈদেহীকে। আরও জানান, খুব শীঘ্রই রাম তাঁর সৈন্যদল নিয়ে আক্রমণ করবে এই লঙ্কাপুরী। একেবারে শত্রুপুরীর অন্দর মহলে থেকে এইভাবে সীতার রক্ষণাবেক্ষণ করা আর কারও পক্ষে সম্ভব হত কিনা সন্দেহ আছে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে বিভীষণ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সাহায্য করেছিলেন রামকে, অথচ সরমাকে থাকতে হয়েছিল খোদ রাবণের চোখের সামনে। তেজস্বী মানবী না হলে সম্ভব?

রামায়ণের এক অতীব সুন্দর চরিত্র হল সরমা, যিনি ছিলেন বিভীষণের পত্নী। তবে কেন জানি না প্রথম থেকে বাল্মিকী সরমাকে উপেক্ষাই করে গেলেন তাঁর কাব্যে। সমগ্র মহাকাব্যে তেমনভাবে বিকাশের সুযোগই পেলেন না সরমা। অথচ সরমার ঔদার্য্য ও ত্যাগ সত্যিই দৃষ্টান্তস্বরূপ।

সরমা নানাভাবে আশ্বস্ত করলেন সীতাকে। তিনি নিজে রাক্ষসপত্নী হয়েও যে উদার মনের পরিচয় দিয়েছেন তাতে বিস্ময় জাগে। অশোক বনে সরমাই ছিলেন সীতার একমাত্র দরদী। সীতাকে রামের খবরাখবর দেওয়া ছাড়া ও সীতার অনুরোধে সর্বত্রগামী সরমা রাবণের সভায় কী পরামর্শ করছেন আসন্ন যুদ্ধ নিয়ে তাও জেনে এসেছিলেন। বলেছিলেন সীতাকে, খুব তাড়াতাড়ি রামের সঙ্গে মিলন হবে তাঁর।

এরপর বাল্মীকি রামায়ণে সরমার আর কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে সরমার প্রসঙ্গ আবার আসে যখন তাঁর পুত্র তরণীসেন যুদ্ধযাত্রার আগে মায়ের আশীর্বাদ নিতে আসে। মায়ের মন ভয়ে কেঁপে ওঠে, পুত্রকে বলেন, রাক্ষসকুলকে ধ্বংস করার জন্যই বিষ্ণুরূপী রামের এই পৃথিবীতে আগমন, তাঁর ধার্মিক পিতাও তা জানে এবং সে জন্য রাবণের পক্ষ ছেড়ে রামের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। তাই সরমা পুত্রকে যুদ্ধে যেতে বাধা দেন। কারণ এই যুদ্ধে রাক্ষসদের পরাজয় নিশ্চিত। তরণী মাতৃ আদেশ অমান্য করে রাবণের পক্ষে যুদ্ধ করাকেই প্রকৃত বীরের কাজ বলে মনে করেন। পরবর্তীতে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর আর কোথাও সরমার উল্লেখ নেই কেন, তা অবাক করে। এমন কী যুদ্ধশেষে বিভীষণের অভিষেককালে কিম্বা রামসীতার মিলনকালেও তাঁকে দেখা যায় না। যে সরমা সীতার বন্দীদশায় তাঁর ছায়াসঙ্গী ছিলেন, তাঁকে কেন এত উপেক্ষা বাল্মিকী ও কৃত্তিবাসে এর ব্যাখ্যা মেলে না কোনও।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত কিন্তু এই অবিচার মেনে নেন নি। তিনি তাঁর 'মেঘনাদ বধ কাব্য'-তে সরমাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। সুখের দিনের সঙ্গী হয় অনেকেই, কিন্তু সীতার অত্যন্ত দুঃখের সময়ে যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সরমা, তাঁর আর কিছুটা হলেও সম্মানপ্রাপ্য, তাই না? সম্পূর্ণ রামায়ণে সরমার কোনও ব্যক্তিগত সুখ ও বেদনার কথা জানতে পারা যায় না, সীতার সুখদুঃখই যেন তাঁর জীবনকাহিনী হয়ে ওঠে। সীতার বন্দীজীবনের এই অমূল্য রত্নটি কি খানিকটা ভাগ্যদোষেই উপেক্ষিতা রয়ে গেলেন?

বিক্রমের শেষ সেকেন্ডগুলি

ইসরো: হ্যালো, হ্যালো! চন্দ্রযান চাঁদের ছবি পাঠাতে শুরু করেছে!

বৈদান্তিক: দেখুন, দেখুন! চাঁদে ব্রহ্ম নেই! বলেছিলুম না, ব্রহ্ম একটাই। সে কেবল হিন্দুরাষ্ট্রে থাকে!

বেদজ্ঞ: আপনি ভুলে যাবেন না যে চাঁদ ব্যাপারটা বেদেও আছে। চাঁদের ইংরিজি মুন আসলে মুনি থেকে নেওয়া।

দার্শনিক: বৈদিক ঋষিরা কি চাঁদে পুষ্পকরথ পাঠিয়েছিলেন?

মন্ত্রী: এই! ভাষণের কপিটা দে তো। চাঁদের ছবি ভাল করে লক্ষ্য করবি। হনুমান কিংবা রামচন্দ্রের মুখ দেখলেই পুরাণের রেফারেন্স দিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করবি।

ইসরো: এই দেখুন! চাঁদের সব চাইতে স্পষ্ট ছবি।

ভক্ত: ইস! খালি গর্ত আর গর্ত! বোঝাই যাচ্ছে সত্তর বছরে চাঁদে কিস্যু হয় নি। এবার দেখবেন একশ তিরিশ কোটি মানুষের ইচ্ছায় আমরা নতুন চাঁদ তৈরি করব —(মন্ত্রীকে) স্যার! ঠিক আছে?

মন্ত্রী: তোকে চাঁদের ছবি ভাল করে দেখতে বলেছি গর্দভ! আমি যে কথাটা মাইকে বলব ভাবছিলাম, সেটা তুই বলে দিচ্ছিস কেন?

ভক্ত: সরি স্যার!

মন্ত্রী: চাঁদের পাহাড়গুলো ভাল দেখ! যে শ্যাডোটা পড়েছে তার সঙ্গে রামের মুখের মিল আছে না?

ভক্ত: একদম স্যার!

ইসরো: চন্দ্রযান ব্রেক কষতে শুরু করেছে। আর মাত্র সাত মিনিট!

বেদজ্ঞ: ব্রেক কষছে কেন? স্পেসে কি স্পিড ব্রেকার আছে?

গণধোলাইকর: এটা হিন্দু চাঁদ। এখানে ওসব নেই।

দার্শনিক: মুসলিম চাঁদও আছে নাকি?

গণধোলাইকর: ইদের দিন মুসলিমরা কি এই চাঁদই দেখে?

দার্শনিক: তাই তো জানি।

বৈদান্তিক: বলেন কী! বিক্রম নিশ্চই চাঁদে নামার আগে গঙ্গাজল স্প্রে করবে? সিগন্যালের শুদ্ধিকরণ না হলে কিন্তু সমাজ নেবে না।

ইসরো: দুঃখিত! আপনারা অকারণ তর্ক করছেন। বিজ্ঞানের কাছে চাঁদের কোনও ধর্ম নেই। হিন্দু-মুসলিম-হরিজন-পার্সি— সবার জন্য একটাই চাঁদ।

বৈদান্তিক: এটা শঙ্করাচার্য থেকে টোকা। চন্দ্র এক ও অদ্বিতীয়।

বেদজ্ঞ: ব্রহ্মও তাই।

বৈদান্তিক: আলবাৎ!

দার্শনিকঃ: তবে দুটো জিনিস কী ভাবে এক এবং অদ্বিতীয় হয়?

ইসরো: আর মাত্র তিন মিনিট।

মন্ত্রী: নেমে গেছে। মাইক্রোফোন কই?

ইসরো: নামে নি। আরো দু-মিনিট বাহান্ন সেকেন্ড।

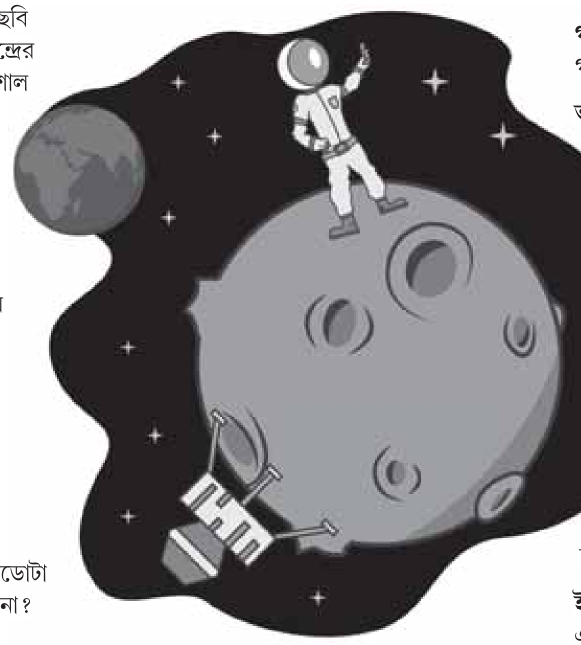

গণধোলাইকর: স্যার! একটু গণধোলাই দিয়ে আসি! বিজ্ঞানের নামে বড্ড বেশি বকছে!

মন্ত্রী: কিছুক্ষণ পর আমি যখন বলব রকেট আমিই নামিয়েছি— তখন দিও। এখন সাংবাদিকরা আছে।

গসা (গদগদ সাংবাদিক): আপনি যা করবেন সেটাই ঠিক। উনি ধোলাই শুরু করতে পারেন। আমরা সে খবর চেপে দিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় মন্দির প্রতিষ্ঠার রিপোর্ট ছেপে দেব।

ইসরো: আর মাত্র আড়াই মিনিট!

মন্ত্রী: বন্ধুগণ!

ভক্ত: দেশমাতা কি জ্জ্যায়! জ্জ্যা জ্জ্যা মাতা! জ্জ্যা জ্জ্যা মাতা! নাসা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে!

বেদজ্ঞ: নাসা তো বেদে আছে।

দার্শনিক: অ্যাঁ! বেদে নাসা? কই, বৈদিক নাসা বলে তো কিছু শুনি নি!

ভক্ত: বেদে নাসা না থাকলে স্যাংস্ক্রিতে নাসারন্ধ্র শব্দটা এলো কোত্থেকে?

ইসরো: হ্যালো, হ্যালো! বিক্রমের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না!

বেদজ্ঞ-বৈদান্তিক-ভক্ত: পাকিস্তান! পাকিস্তান! পাকিস্তানের কাজ!

ইসরো: বিক্রম কোনও সাড়া দিচ্ছে না! আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করছি!

মন্ত্রী: কোনও চিন্তা করবেন না। আমরা রকেট ওঠার আগে নারকোল ফাটিয়েছি, পুজো দিয়েছি, যজ্ঞ করেছি।

গণধোলাইকর: বিপদতারিণী কবচ একটা বিক্রমের গায়ে বেঁধে দিয়েছেন তো?

ভক্ত: না। কবচ তো বাঁধা হয় নি।

ইসরো: আমরা বুঝতে পারছি না যে চন্দ্রযান চাঁদে নেমেছে না আছড়ে পড়ে ভেঙে গেছে!

বেদজ্ঞ: মুনি-ঋষিরা সেকালে কত উন্নত মানের মহাকাশ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। কারণ, তাঁরা তিথি-নক্ষত্রে জোড় দিতেন। তাঁদের গণনা ছেড়ে ইসরোকে ক্যালকুলাস কষতে কে বলেছিল?

বৈদান্তিক: আমার ধারনা বিক্রমকে রাহু গিলে ফেলেছে। গ্রহণ শেষ হলেই বেরিয়ে আসবে।

ভক্ত: দেশদ্রোহীরা বালাকোটে গিয়ে পাল্টা যজ্ঞ করেছে। বিক্রম ভুল করে মুসলিম চাঁদে চলে গেছে।

ইসরো: মনে হয় বিক্রমকে আমরা হারালাম! কিন্তু এখনই নিশ্চিত কিছু বলা যাচ্ছে না।

গসা: ভয় দেখাচ্ছেন কেন? চাঁদে যেতে পনের দিন লেগেছে। পনের দিনে কত মিনিট হয়? তারমধ্যে শেষ দু-মিনিট ব্যর্থ। তবে কত মিনিট সফল? পার্সেন্টেজে কত দাঁড়ায়?

মন্ত্রী: তাই তো! তার মানে আমরা সফল। চন্দ্রাভিযান নাইন্টি নাইন পয়েন্ট নাইন সেভেন পার্সেন্টি সফল! ওরে কে আছিস! মাইকটা দে।

দার্শনিক: উত্তেজিত হবেন না। আপনি মাইকে বলার কে? বলেন তো একজনই। ওই যে তিনি যোগাসনে আসছেন!

ভক্ত: ওরে! শাঁখবাজা! উলু দে! বিক্রমের শেষ দু-মিনিট নিয়ে যে প্রশ্ন তুলবে তাঁর নাম এনআরসি তালিকায় সাদা কালিতে লেখা হবে।

(হৈ চৈ। হট্টগোল। তার মধ্যে গসা হোয়াটসঅ্যাপে লেখেন 'বিক্রম কান্ট বি ফেইলড কজ্ দেয়ার ইস নো নেহেরু ইন দ্য মুন'।)

অনু ঘটক

ডুয়ার্সের বই। রংরুট-এর বই

আমাদের বইপত্র এখন নিজের ঠিকানাতেই পেতে পারেন

বিষয় ডুয়ার্স

ডুয়ার্স বেস্ট সেলার

তিস্তা - উৎস থেকে মোহনা। অভিজিৎ দাশ। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি। দেবপ্রসাদ রায়। ১৫০ টাকা ***
চায়ের ডুয়ার্স কী চায়? গৌতম চক্রবর্তী ১১০ টাকা
ডুয়ার্সের চা অবলুপ্তির পথে? সৌমেন নাগ। ১৫০ টাকা ***
আলিপুরদুয়ার। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
কোচবিহার ২য় সংস্করণ। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ২৫০ টাকা
জলপাইগুড়ি। প্রদোষ রঞ্জন সাহা সম্পাদিত। ৩০০ টাকা

ডুয়ার্সের গল্প সংকলন

ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো। সাগরিকা রায়। ১৫০ টাকা
চারপাশের গল্প। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১০০ টাকা ***
লাল ডায়েরি। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
সব গল্পই প্রেমের নয়। হিমি মিত্র রায়। ১৬০ টাকা

ডুয়ার্সের পেপারব্যাক সিরিজ

ডুয়ার্সের দশ উপন্যাস। সংকলন। ১৯৫ টাকা
তরাই উৎরাই। শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৬৫ টাকা
লাল চন্দন নীল ছবি। অরণ্য মিত্র। ১১০ টাকা
শালবনে রক্তের দাগ। ১২৫ টাকা
অন্ধকারে মৃত্যু-আলিঙ্গন। বিপুল দাস। ৫৫ টাকা
মেঘের পর রোদ। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। ৫৫ টাকা
কুহুলিয়াদের দেশে। সুকান্ত গাঙ্গুলী। ৫৫ টাকা

ডুয়ার্সের কাব্য চর্চা

পঞ্চাশ পর্যটন শেষে মাধুকরী ধান। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা
ডুয়ার্সের হাজার কবিতা। অমিত কুমার দে সম্পাদিত। ৫০০ টাকা
বোধিবৃক্ষ ছুঁয়ে এক চির ভিক্ষুক। অমিত কুমার দে। ২৫০ টাকা

বিষয় পর্যটন

আমাদের পাখি।
তাপস দাশ ও উজ্জ্বল ঘোষ। ৪৯৫ টাকা
সিকিম। সংকলন। ২০০ টাকা ***
নর্থ ইস্ট নট আউট।
গৌরীশংকর ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা
রংরুটে হিমালয় দর্শন।
সংকলন। ২০০ টাকা ***
উত্তরবঙ্গের হিমালয়ে।
প্রদোষ রঞ্জন সাহা। ২০০ টাকা ***
সব্যসাচীর সঙ্গে জলে জঙ্গলে। সংকলন
১৫০ টাকা ***
মধ্যপ্রদেশের গড় জঙ্গল দেউলে।
সুভদ্রা উর্মিলা মজুমদার। ২০০ টাকা ***
সুন্দরবন অনধিকার চর্চা।
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী। ১৫০ টাকা ***

প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। ১১০ টাকা
জয় জল্পেশ। শুভ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৯০ টাকা

অরণ্য কথা বলে।
শুভ্রকান্তি সিনহা। ১৫০ টাকা ***
সে আমাদের বাংলাদেশ।
গৌতম কুমার দাস। ২০০ টাকা
পাসপোর্ট প্রতিবেশিদের পাড়ায়।
দীপিকা ভট্টাচার্য। ১৫০ টাকা ***
তিন মহাদেশ দশ দিগন্ত।
শান্তনু মাইতি। ১৭৫ টাকা

বাড়িতে বসেই অর্ডার দিন আমাদের বই। পেয়েও যাবেন নিজের ঠিকানাতেই।

হোয়াটসঅ্যাপ করুন ৬২৯৭৭৩১১৮৮ নম্বরে

ন্যূনতম ৩০০ টাকার অর্ডার দিতে হবে। ৫০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার দিলে ডিসকাউন্ট মিলবে ২০%।
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কোনও ঠিকানায় ক্যুরিয়ার খরচ লাগবে না।

আমাদের বই যে সব দোকানে পাওয়া যায় (বই না পেলে অর্ডার করুন)

কলকাতা: দে'জ ও দে বুক স্টোর, কলেজ স্ট্রিট। **রিড বেঙ্গলি বুক স্টোর** ৪২ এ সর্দার শংকর রোড, কলকাতা ২৯। ফোন ৮১০০৯০৫৫৬৬

শিলিগুড়ি: বিশ্বাস বুক এজেন্সি, হিলকার্ট রোড বাটা গলি। **জলপাইগুড়ি: ভবতোষ ভৌমিক** কমার্স কলেজের বিপরীতে **আলিপুরদুয়ার: ম্যাগাজিন সেন্টার** কলেজ হল্ট। **কোচবিহার: দাস নিউজ এজেন্সি** বড় পোস্টাপিসের বিপরীতে। **ফালাকাটা:** পাঞ্চজন্য। **মালবাজার: বইঘর,** আদর্শ বিদ্যাপীঠের উল্টোদিকে। **বিন্নাগুড়ি:** সিটি বুক স্টল। **বানারহাট:** গ্রন্থ ভারতী। **বীরপাড়া:** পোকিসা। **মালদা:** পুনশ্চ। **রায়গঞ্জ:** ধানসিঁড়ি।

*** প্রায় নিঃশেষিত

অনলাইনে কিনুন আমাদের বইপত্র www. readbengalibooks.com

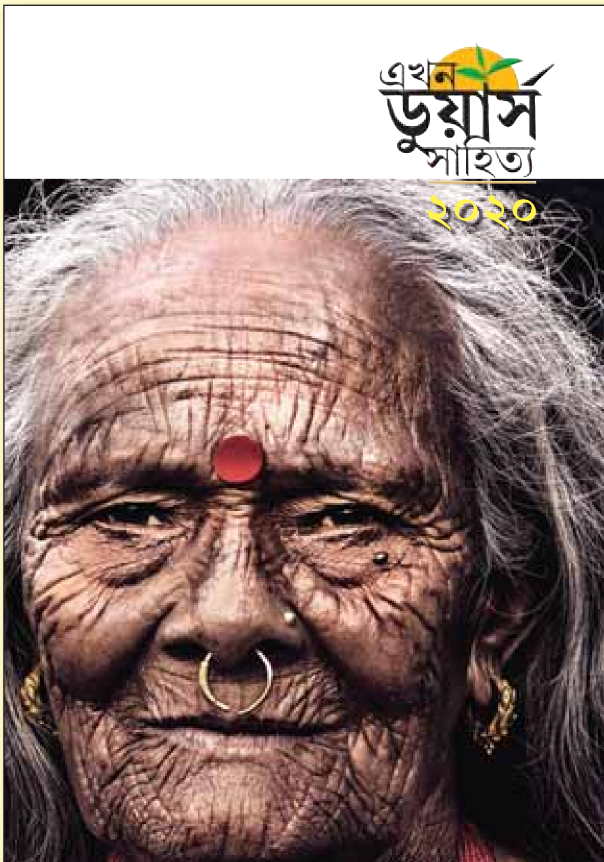

এ সময়ে বাংলার উত্তরে সাহিত্যচর্চার সেরা সংকলন

উপন্যাস

বিপুল দাস। তনুশ্রী পাল। অমিত কুমার দে। শুভময় সরকার। অভিজিৎ সরকার। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

গল্প

পীযুষ ভট্টাচার্য। অর্ণব সেন। অরুণাভ ভৌমিক। বিমল লামা। দিবাকর ভট্টাচার্য। গৌতমেন্দু রায়। তপতী বাগচি। সাগরিকা রায়। কল্যাণ গোস্বামী। রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়। সুচন্দ্রা ভট্টাচার্য। দীপালোক ভট্টাচার্য। শাশ্বতী চন্দ। রম্যাণী গোস্বামী। সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। শ্বেতা সরখেল। রাখি পুরকায়স্থ। দেবপ্রিয়া সরকার। মানিক সাহা। রঙ্গন রায়। সন্দীপন নন্দী। সত্যম ভট্টাচার্য। সৌমিত্র চৌধুরী। সুব্রত চক্রবর্তী। শাঁওলি দে। হিমি মিত্র রায়। সৌগত ভট্টাচার্য। শতরূপা নাগপাল। ইপ্সিতা সোম। অগ্রদীপ দত্ত।

কবিতা

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত কবিতা। সন্তোষ সিংহের রাজবংশী কবিতাগুচ্ছ। সমীর চট্টোপাধ্যায়। অমর চক্রবর্তী। কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য। সমর রায়চৌধুরী। রাণা সরকার। বিজয় দে।

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস। সুজিত দাস। নিখিলেশ রায়। অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়। রত্নদীপা দে ঘোষ। সেবন্তী ঘোষ। অনিন্দিতা গুপ্ত রায়। সোমা বৈদ্য। সুদীপ্ত মাজি। সুবীর সরকার। নিঝুম ঠাকুর। অমিত দে। জয়শীলা গুহ বাগচী। মনোনীতা চক্রবর্তী। সৌমনা দাশগুপ্ত। স্বপ্ননীল রুদ্র।

শ্যামলী সেনগুপ্ত। শুক্লা রায়। সম্পা দত্ত দে। পাপড়ি গুহ নিয়োগী। সৌম্য সরকার। নীলাদ্রি দেব। মারুফ আহমেদ নয়ন। নির্মাল্য ঘোষ। অনুপ ঘোষাল। অভিজিৎ দাশ। দীপায়ন পাঠক। শক্তিপ্রসাদ ঘোষ। সুপ্রিয় চন্দ। প্রশান্ত নাথ চৌধুরী। অমিত পাল। হেমন্ত সরখেল। তুহিন শুভ্র মন্ডল। জ্যোতির্ময় মুখার্জি। তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস। মহুয়া। সন্দীপ শর্মা।

পরিবেশক ও প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি। বিশ্বাস বুক এজেন্সি, বাটা গলি, হিলকার্ট রোড ৯৪৩৪৩২৭৩৪২ **জলপাইগুড়ি।** ভবতোষ ভৌমিক, কমার্স কলেজের বিপরীতে ৯৭৩৩২৪৬৯১৩ **আলিপুরদুয়ার।** দীপক কুমার হোড়, কলেজ হল্ট ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭ **কোচবিহার।** জয়ন্ত দাস, বড় পোস্ট অফিসের বিপরীতে ৯৪৩৪২১৭০৮৪ **মালদা।** অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি ৭৮৬৪৯৯৫৫১৫ **কলকাতা।** বিশাল বুক সেন্টার, ৪ টোটি লেন, নিউ মার্কেট। ৪০৬৪৪০৯৭ অথবা না পেলে যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে ৯৮৩০৪১০৮০৮।

সম্পাদক শুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ৫১২ পৃষ্ঠার পেপারব্যাক। মূল্য ১৯৫ টাকা

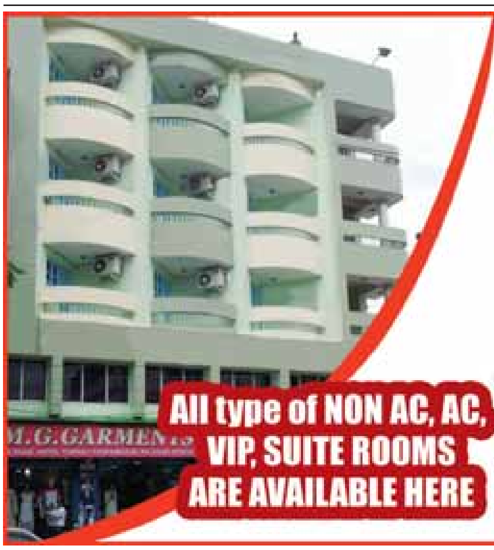

WEL COME
HOTEL YUBRAJ
&
RESTAURANT MONARCH
CHARU ARCADE | B. S. ROAD | COOCHBEHAR
CONTACT NO.
+91 9735526252, (03582) 227885
Email: hotelyubrajcoochbehar@gmail.com
www.hotelyubrajcoochbehar.com

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 3 Rajdanga Gold Park, Kolkata 700107, Editor - Pradosh Ranjan Saha.